সূচী

প্রথম অধ্যায়—এটম বোমার তত্ত্বীয় পরিপ্রেক্ষিত	৯
দ্বিতীয় অধ্যায়—এটম বোমার রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত	১৯
তৃতীয় অধ্যায়—একটি প্রক্ষেপণ—ভারী পানির কাহিনী	৩২
চতুর্থ অধ্যায়—ট্রিনিটি—প্রথম পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা	৪০
পঞ্চম অধ্যায়—গর্ভনাটিকা—বিজ্ঞানী বনাম রাজনীতিবিদ	৪৫
ষষ্ঠ অধ্যায়—সংহার পর্ব—হিরোশিমা ও নাগাসাকি	৫৬
সপ্তম অধ্যায়—পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার অশনি সংকেত	৬৫
অষ্টম অধ্যায়—মহাপ্রলয়ের সর্বাত্মক ব্যবস্থা	৭৫
পরিশিষ্ট	৯০

banglainternet.com

এক মেগাটন বোমার বিধ্বংসী ক্ষমতা

সোভিয়েত রাশিয়ার ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপ যোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র এস, এস-৩০

যুক্তরাষ্ট্রের ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য পার্শিং ক্ষেপণাস্ত্র।

ইটালীয় পদার্থ বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি পৃথিবীর প্রথম পারমানবিক গাদা (Pile) সিকাগোতে নির্মিত হয়েছিল ফার্মির পরিচালনায়।

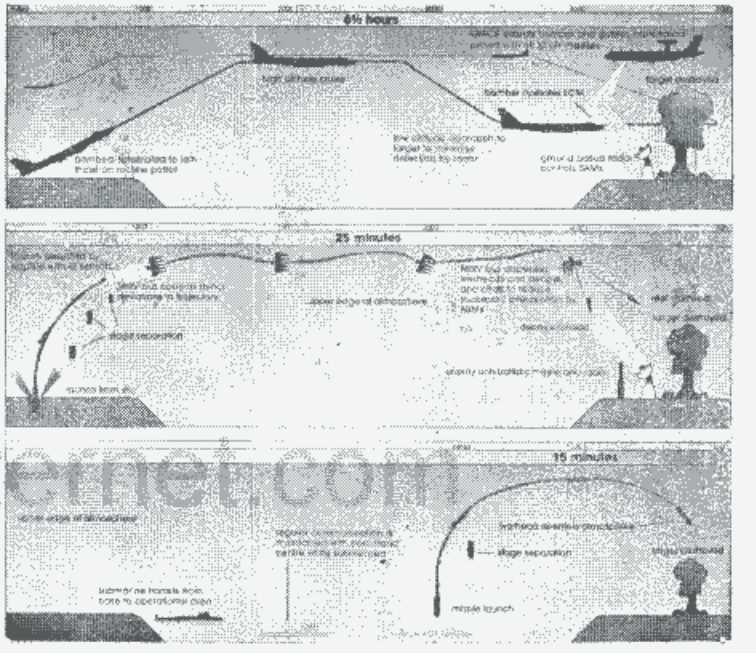

(ক) মনুষ্য চালিত বোমারু বিমান
(খ) আন্তঃ মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র
(গ) সাবমেরিণ থেকে উৎক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র

অটো হান। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে অটোহান ও ফ্রিৎস ষ্ট্যাসম্যান ইউরেনিয়াম পরমাণুকে দ্বিখণ্ডিত করে প্রদর্শন করলেন যে পারমানবিক শক্তির ব্যবহার সম্ভব হতে পারে।

প্রথম অধ্যায়

এটম বোমার তত্ত্বীয় পরিপ্রেক্ষিত

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আলবার্ট আইনস্টাইন নামে সুইস পেটেন্ট অফিসের একজন অজ্ঞাতনামা কর্মচারী মানুষের চিন্তার জগতে কয়েকটি বৈপ্লবিক ধারণার আমদানি করেছিলেন। এই ধারণাগুলির একটি ছিল : ভর ও শক্তির বিনিময়তা। এই ধারণাটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন একটি পরিচ্ছন্ন সমীকরণের সাহায্যে। তাঁর সেই বিখ্যাত সমীকরণটি হল, $E = mc^2$। E দ্বারা বোঝান হয়েছে শক্তি, m দ্বারা ভর এবং c দ্বারা প্রতি সেকেণ্ডে আলোর বেগ। ভাষায় প্রকাশ করলে সমীকরণটির অর্থ হল, পদার্থের ভরকে আলোর বেগের বর্গ দ্বারা গুণ করলে যে শক্তি পাওয়া যায় সেটাই হল ঐ পরিমাণ পদার্থের আবদ্ধ শক্তি। আমরা জানি যে আলোর বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৩০ কোটি মিটার (১,৮৬,০০০ মাইল)। সুতরাং খুব সামান্য পরিমাণ পদার্থকেও যদি ৩০ কোটির বর্গ দিয়ে গুণ করা হয় তাহলে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে সেটার হিসাব বের করা খুব কঠিন নয়।

হিসাবটা সহজ হলেও কাজটা খুবই দুরূহ। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আইনস্টাইনের ঐ সমীকরণটির ব্যবহারিক গুরুত্ব ছিল অতি সামান্যই। কারণ পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার কৌশল তখনও মানুষের অজ্ঞাত। পদার্থের গঠন সম্বন্ধে তখনও পর্যন্ত তার ধারণা খুবই অস্বচ্ছ। পদার্থ আসলে কি? তার গঠন কি পারমাণবিক না অবিচ্ছিন্ন?

দুই হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস পরমাণুর ধারণা প্রবর্তন করেছিলেন। ইংরেজী atom এর প্রতিশব্দ পরমাণু। এই atom শব্দটি আবার গ্রীক atomos শব্দ থেকে উদ্ভূত। শব্দটির অর্থ এমন জিনিস যা অবিভাজ্য। ডেমোক্রিটাসের মতে 'পৃথিবীতে একমাত্র বিদ্যমান পদার্থ হল পরমাণু এবং শূন্যস্থান; আর সব কিছু অভিমত মাত্র।' কিন্তু গ্রীক দার্শনিক ও পণ্ডিত এরিস্টোটলের প্রভাব তখন তুঙ্গে। তাঁর প্রভাব ডেমোক্রিটাস ও তাঁর সমধর্মী পরমাণুবিদদের তত্ত্বকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। মাটি, পানি, বায়ু ও অগ্নি—এই চারটি আদিমূলীয় মৌলের সমন্বয়ে পৃথিবীটা তৈরী হয়েছে বলে এরিস্টোটল তার মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন।

প্রায় দু'হাজার বছর এরিস্টোটলের এই ভ্রান্ত ধারণা মানুষের মনোজগতকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে জন ড্যালটন পদার্থের পারমাণবিক গঠনের ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। অবশ্য তাঁর সমালোচকের অভাব ছিল না। পরমাণুর অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে না দিলেও বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই পরমাণুর অস্তিত্বের সপক্ষে ডালটনের ব্যাখ্যায় আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। অবশেষে বিংশ শতাব্দীতে পদার্পন করে এরিস্টোটলের ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হল এবং ডেমোক্রিটাসের পরমাণুর তত্ত্ব দৃঢ়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। বেকারেল, পিয়ারে কুরি ও মেরি কুরি কর্তৃক তেজস্ক্রিয়তা ও তেজস্ক্রিয় মৌলের আবিষ্কার, থমসন কর্তৃক ইলেকট্রনের আবিষ্কার, তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম ও থোরিয়াম থেকে নির্গত রশ্মির অনুশীলন করার পর সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না যে পদার্থের গঠন সত্য সত্যই পারমাণবিক। বেশ কিছু পরীক্ষার পর রাদারফোর্ড পরমাণুর একটি মডেলও রচনা করলেন। এই মডেল বা নমুনা অনুসারে, পরমাণুর কেন্দ্রে আছে

এক বা একাধিক পজিটিভ আহিত প্রোটনযুক্ত নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াস থেকে তুলনামূলকভাবে বেশ দূরে এবং তাকে কেন্দ্র করে নেগেটিভ আহিত ইলেকট্রনগুলি ঘূর্ণায়মান। পরে অবশ্য আরও জানা গেল যে নিউক্লিয়াসে প্রোটন ছাড়াও আছে অক্রিয় কণা নিউট্রন।

এই নিউক্লিয়াসের গঠনশৈলী সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পরমাণুর ভরের শতকরা ৯৯.৯৭৫ অংশ অবস্থিত এই নিউক্লিয়াসে। এর গড় ঘনত্ব (density) প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে প্রায় ৩×১০^{১৩} কিলোগ্রাম। এর ব্যাস $১০^{-১২}$ সেন্টিমিটার। পরমাণুর ব্যাস প্রায় $১০^{-৮}$ সেন্টিমিটার। পরমাণুর তুলনায় তাই নিউক্লিয়াসের আয়তন খুবই ক্ষুদ্র। অর্থাৎ যেখানে নিউক্লিয়াসের ব্যাস এক সেন্টিমিটারের এক লক্ষ কোটি ভাগ, সেখানে পরমাণুর ব্যাস এক সেন্টিমিটারের দশ কোটি ভাগ। অবশ্য এই দুটি দূরত্বই এতই সূক্ষ্ম যে তাদের পার্থক্যটা মনে বেশি দাগ কাটে না।

প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে নিউক্লিয়াস গঠিত। Z অক্ষরটি দ্বারা প্রোটনের সংখ্যা আর N অক্ষরটি দ্বারা নিউট্রনের সংখ্যা বোঝান হয়। যেহেতু প্রোটন ধনাত্মক আধানযুক্ত, ইলেকট্রন ঋণাত্মক আধানযুক্ত এবং নিউট্রন অক্রিয় (neutral), তাই স্বাভাবিক অবস্থায় গোটা পরমাণুটা অক্রিয়। নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যাকে বলা হয় পরমাণুর ভর সংখ্যা এবং এই ভরসংখ্যা A দ্বারা প্রকাশ করা হয় ($A = Z + N$)। যে সব নিউক্লিতে প্রোটন সংখ্যা (Z) একই, কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা (N) বিভিন্ন, তাদেরকে বলা হয় আইসোটোপ। যে সব নিউক্লির ভর সংখ্যা এক তাদেরকে বলে আইসোবার।

পরমাণুর উপাদান প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেকট্রনের মোট ভরের তুলনায় পরমাণুটির ভর যতটা কম তাকেই শক্তির এককে

banglainternet.com

($E = mc^2$) প্রকাশ করলে আমরা পরমাণুর সংযোগী শক্তির সন্ধান পাই।

হাইড্রোজেন পরমাণুতে আছে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন। তাই ধারণা করা হয়েছিল যে এই হাইড্রোজেন পরমাণু হল অন্যান্য পরমাণুর গাঁথুনি ইট। কিন্তু হাইড্রোজেন মৌল দুটি আইসোটোপীয় অবস্থায় বিদ্যমান—প্রোটিয়াম এবং ডয়টেরিয়াম। প্রকৃতিতে বিদ্যমান হাইড্রোজেন মৌলের শতকরা ৯৯.৯৮৫ ভাগই প্রোটিয়াম এবং মাত্র ০.০১৫ ভাগ ডয়টেরিয়াম। প্রোটিয়ামের পারমাণবিক ভর ১.০০৭৮২ u (u হল পারমাণবিক ভরের একক)। চারটি প্রোটিয়াম পরমাণু যুক্ত করলে একটি হিলিয়াম পরমাণু তৈরি হওয়ার কথা। আর তাই হিলিয়ামের পারমাণবিক ভর হওয়া উচিত ৪.০৩১২৮ u (১.০০৭৮২ × ৪)। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে হিলিয়াম পরমাণুর ভর মাত্র ৪.০০২৬ u, অর্থাৎ যে ভর হওয়া উচিত তার শতকরা ০.৭ ভাগ কম।

যে সংযোজনী পদ্ধতিতে হিলিয়াম সৃষ্টি হয়েছিল তাতে ভর বিনষ্ট হয়েছে। আমরা যদি আইনস্টাইনের ভর ও শক্তির বিনিময়তায় বিশ্বাস করি, তাহলে ভরের এই বিনাশের মাধ্যমে মুক্ত হবে শক্তি এবং আইনস্টাইনের $E = mc^2$ যদি সঠিক হয় তাহলে এই শক্তির পরিমাণ হবে বিপুল।

কিন্তু তখনও পর্যন্ত (বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক) এই শক্তিকে মুক্ত করার জ্ঞান ও কৌশল ছিল অজ্ঞাত। হাল্কা মৌলগুলিকে গলনের (fusion) জন্য অকল্পনীয় উচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োজন। বেশির ভাগ বিজ্ঞানীদের তাই ধারণা হয়েছিল যে দুটি হাল্কা পরমাণু গলনের দ্বারা কিংবা কোন ভারী পরমাণুকে ভেঙে শক্তি মুক্ত করা অসম্ভাব্য।

কিন্তু সে সময় যে কাজটাকে মনে হয়েছিল অসম্ভব, কয়েক

দশকের মধ্যেই সেটা বেশ সফলতার সাথেই সম্পন্ন হল। একটি তত্ত্বীয় ধারণার বাস্তব রূপায়নে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী তাঁদের নিজ নিজ অবদান রেখেছেন। এইসব বিজ্ঞানীদের সমবেত প্রচেষ্টার ফলেই শেষ পর্যন্ত সম্ভব হল পরমাণুর শক্তিকে মুক্ত করা। এই অগ্রগতির ক্রমবিকাশ এতই চমকপ্রদ যে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শুরু থেকেই পারমাণবিক শক্তির সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মধ্যে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল। অবশ্য সব বিজ্ঞানীই যে এই সম্ভাবনায় আস্থাশীল ছিলেন তা নয়। পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার দিকপাল রাদারফোর্ড পারমাণবিক শক্তির সম্ভাবনায় খুব আশাবাদী ছিলেন না। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এক ভাষণে তিনি খোলাখুলি বলেছিলেন :

"These transformations of the atom are of extra-ordinary interests but we cannot control atomic energy to an extent which would be of any value comercially, and I belive we are not likly to be able to do so....."

পক্ষান্তরে, ফ্রান্সের ফ্রেডারিক জোলিয়ো কুরি এবং ইংলণ্ডে আগত বাস্তুহারা হাঙ্গেরীয় বিজ্ঞানী লিয়ো শিলার্ড পারমাণবিক শক্তির সম্ভাবনায় বেশ আস্থাবান ছিলেন। জোলিয়ো কুরি তাঁর নোবেল বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন :

"If surveying the past we look at the progress achived by science at an ever-increasing place, we are right to think that researchers, building up or breaking down the elements at will, will know how to bring about transmutations of an explosive character, like chemical chain reactions, one transmutation provoking many others. If such transmutations come to take place in matter, we can expect the release of enormous amounts of useful energy."

banglainternet.com

রাদারফোর্ড, নীল্‌স বোর, জোলিয়ো কুরি, ফার্মি এবং আরও অনেক বিজ্ঞানীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ত্রিশের দশকে পারমাণবিক পদার্থবিদ্যায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। পরমাণুর রহস্য উন্মোচনে তাঁদের এই প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত হলেন দু'জন রসায়নবিদ।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে জার্মানীর অটোহান এবং স্ট্রাসম্যান নামে দু'জন রসায়নবিদ ইউরেনিয়াম-২৩৫ মৌলের পরমাণু ভাঙতে সফল হলেন। ২২শে ডিসেম্বর তাঁদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশের জন্য তাঁরা পত্রিকায় পাঠালেন। অটোহান ও লিজে মেইটনার ছিলেন বহুদিনের সহকর্মী। জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুদয়ের পর ইহুদী মেইটনার জার্মানী ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। মেইটনারের ভাইপো বিজ্ঞানী অটো ফ্রিস আশ্রয় নিয়েছিলেন কোপেনহাগেনে, নীল্‌স বোরের গবেষণাগারে তিনি কাজ করছিলেন। খ্রীষ্টমাসের সময় ফ্রিস ফুফুর সাথে মিলিত হলেন এবং তাঁর কাছ থেকে পরমাণু বিভাজনের এই ঘটনাটা জানতে পারলেন। অটোহান তাঁদের গবেষণার ফল চিঠির মাধ্যমে মেইটনারকে জানিয়েছিলেন। সমস্ত পূর্ব অভিজ্ঞতার বিরোধী এই ঘটনাটা ছিল এতই বিচিত্র যে ফ্রিস বার্লিন গবেষণাগারের ফলাফলের প্রতি ঠিক বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি। কিন্তু ফুফুর প্রভাবে অচিরেই তাঁর সন্দেহ দূর হল। তাঁরা দুজনে মিলে এই বিক্রিয়ার একটা ব্যাখ্যা তৈরি করলেন আইন-স্টাইনের সেই বিখ্যাত ভর ও শক্তির সমীকরণটি ব্যবহার করে।

ছুটির শেষে ফ্রিস ফিরে এলেন কোপেনহাগেনে। কালবিলম্ব না করে তিনি নীল্‌স বোরকে টেলিফোনে সব বৃত্তান্ত জানালেন। নিমেষের মধ্যেই বোর ঘটনার সামগ্রিক তাৎপর্য উপলব্ধি করলেন। তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার পঞ্চম ওয়াশিংটন অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার জন্য আমেরিকায় পাড়ি দেওয়ার প্রাক্কালে তিনি ফ্রিসকে আশ্বস্ত করলেন

যে তাঁদের প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হওয়ার আগে তিনি সমুদয় বিষয়টা গোপন রাখবেন।

বোরের সফরসঙ্গী ছিলেন রোজেনফেল্ড নামে একজন গণিতজ্ঞ। বোর তাঁকে ঘটনাটা জানিয়েছিলেন এবং দু'জনে মিলে এই ঘটনার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার অন্বেষণে বেশ কিছু কাজকর্ম করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস এই যে তিনি রোজেনফেল্ডকে এই আবিষ্কারের গোপনীয়তা রক্ষার নির্দেশ দিতে বিস্মৃত হয়েছিলেন। ফলে বার্লিন গবেষণাগারের আবিষ্কার এবং ফ্রিস ও মেইটনারের ব্যাখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই রোজেনফেল্ডের মাধ্যমে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা জ্ঞাত হলেন। জর্জ গ্যামো ঘটনাটি জানার সাথে সাথেই সে রাত্রে ওয়াশিংটনে এডওয়ার্ড টেলরকে (ইনিও বাস্তুহারা হাঙ্গেরীয় বিজ্ঞানী) টেলিফোনে ব্যাপারটা জানালেন। বোর প্রিন্সটনে পৌঁছানোর পূর্বেই হান-স্ট্রাসম্যানের পরীক্ষা সম্পাদনের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। নিজের ভুল বুঝতে পেরে বোর বিব্রত হয়ে তৎক্ষণাত ফ্রিসকে তাঁদের প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য টেলিগ্রাম করলেন। অবশ্য অচিরেই এই নাটকের অবসান ঘটল। বোর জানতে পারলেন যে হান-স্ট্রাসম্যান এবং ফ্রিস-মেইটনারের প্রবন্ধগুলি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

২৭শে ডিসেম্বরের অধিবেশনে বোর পরমাণুর ভাঙন ও তার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীদের কাছে ঘোষণা করলেন। বোরের ভাষণ শেষ হওয়ার আগেই শ্রোতাদের মধ্য থেকে বেশ কয়েকজন দ্রুত সভাকক্ষ ত্যাগ করে টেলিফোনে ব্যাপারটা স্ব স্ব গবেষণাগারে জানালেন। কয়েকদিনের মধ্যেই ওয়াশিংটনের কারনেজ ইনস্টিটিউসন এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা হান-স্ট্রাসমেন আবিষ্কারকে স্বীকৃতি জানালেন।

banglainternet.com

কারণ পারমাণবিক বোমা নির্মাণের চাবিকাঠি নিহিত ছিল এই আবিষ্কারটিতে। নির্দিষ্ট কোন কোন ভারী পরমাণুর (যেমন ইউরেনিয়াম-২৩৫, প্লুটোনিয়াম-২৩৯) একের পর এক পর্যায়ক্রমিক বিভাজন প্রক্রিয়াকে সমপ্রতিক্রিয়াধারা বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় দুটি কিংবা তিনটি নিউট্রনসহ শক্তিময় কণা মুক্ত হয়। সহজে বিদারণীয় মৌল (ইউরেনিয়াম, ২৩৫, প্লুটোনিয়াম-২৩৯) দ্বারা বন্দীকৃত এই নিউট্রন পরবর্তী পর্যায়ের বিভাজন ঘটায় এবং এ ভাবেই ধারাটা চলতে থাকে। পারমাণবিক চুল্লী এবং পারমাণবিক বোমায় এই প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

পারমাণবিক শক্তি বা অস্ত্র উৎপাদনের জন্য দরকার এমন একটি প্রক্রিয়ার সূচনা করা যাকে বলা হয় সমপ্রতিক্রিয়াধারা (chain reaction)। ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস মোটামুটি সমান দু' ভাগে বিভক্ত হলে যদি সেই সাথে এক বা একাধিক নিউট্রন নির্গত হয় তাহলেই শুধু সমপ্রতিক্রিয়াধারা ঘটানো সম্ভব। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে জোলিয়ো কুরি ও তাঁর সহযোগিরা প্রদর্শন করলেন যে ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস ভাঙলে নিউট্রন নির্গত হয়। এর আগেই অবশ্য ঝিলার্ড ও ফার্মি বিভাজন পদ্ধতিতে নিউট্রন নির্গমনের উপর তাঁদের প্রবন্ধ ফিজিক্যাল রিভিউ পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন এই শর্তসহ যেন সেটি তখন প্রকাশিত না হয়। এই আবিষ্কারের মারাত্মক সম্ভাবনা ও পরিণতি সম্বন্ধে ঝিলার্ড ও ফার্মি সচেতন ছিলেন। তাঁরা টেলিগ্রামে জোলিয়ো কুরিকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন এ সম্পর্কিত তথ্যাদি পত্রিকায় প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকার জন্য। জোলিয়ো কুরি ও তাঁর সহযোগিরা এই অনুরোধকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন এবং এই সন্দেহের সঙ্গত কারণও ছিল। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে সমপ্রতিক্রিয়াধারার অন্বেষণে ফরাসীরা অন্যদের

তুলনায় বেশ অনেকখানি এগিয়ে ছিল। উপরন্তু ওয়াশিংটনের কারনেজ ইনস্টিটিউসনে রিচার্ড রবার্টস-এর নেতৃত্বাধীন একটি দল ইতিমধ্যেই ইউরেনিয়াম থেকে নিউট্রন নির্গমনের উপর একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছিল 'বিজ্ঞান সেবা' (Science service) নামে একটি সংবাদ সংস্থার কাছে। জোলিয়ো কুরি তাই গোপনীয়তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। ১৫ই এপ্রিল ফিজিক্যাল রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হল ঝিলার্ড ও তাঁর সহকর্মীদের প্রবন্ধ। এক সপ্তাহ পরে 'ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস বিভাজনে নির্গত নিউট্রনের সংখ্যা' শিরোনামে ফরাসী বিজ্ঞানীদের একটি নূতন প্রবন্ধ 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হল। এই প্রতিবেদনে বলা হল যে নিউট্রনের গড় সংখ্যা ৩ থেকে ৪ এর মধ্যে। ফরাসী বিজ্ঞানীরা তাঁদের অগ্রগামী অবস্থার পরিচয় দিলেন দ্রুত পাঁচটি পেটেন্ট গ্রহণ করে। ইউরেনিয়াম ও মডারেটর কি অনুপাতে সন্নিবিষ্ট করতে হবে এবং সন্নিবেশে তাদের সমসত্ত্ব (homogeneous) এবং অসমসত্ত্ব (hetenogeneous) বিন্যাস এই পেটেন্টে বর্ণিত হয়েছিল। বিভাজনে নির্গত নিউট্রন মন্দনের জন্য মডারেটর হিসাবে বেরিলিয়াম, গ্রাফাইট, পানি এবং ভারী পানি ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছিল। সমপ্রতিক্রিয়াধারাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বেশ কয়েকটি উপায় আলোচিত হয়েছিল এবং উৎপন্ন তাপকে কিভাবে সংগ্রহ করা যায় সে সম্বন্ধে কয়েকটি পদ্ধতিও এই পেটেন্টে বর্ণিত হয়েছিল।

এটম বোমা বা পারমাণবিক বোমা আসলে কি?

ইউরেনিয়াম—২৩৫ কিংবা প্লুটোনিয়াম—২৩৯ এর মত সহজে বিদারণীয় পদার্থে বিস্ফোরণমুখী দ্রুত নিউট্রন সমপ্রতিক্রিয়াধারা সৃষ্টির কৌশলকেই বলা হয় পারমাণবিক বোমা। অবশ্য বৃহত্তর অর্থে পারমাণবিক বিক্রিয়া থেকে যাদের শক্তি উৎপন্ন হয় সেই সব

banglainternet.com

বিস্ফোরক কৌশলকেই পারমাণবিক বোমা বলা যায়। এই শেষোক্ত অর্থে ভারী পরমাণুর বিভাজনের (fission) ভিত্তিতে নির্মিত বিভাজন বোমা এবং হাল্কা পরমাণুর গলনে (fusion) নির্মিত 'ফিউসন' বোমা এই উভয়কেই পরমাণু বোমা বলা উচিত। কিন্তু সাধারণভাবে 'ফিউসন' বোমাকে আমরা হাইড্রোজেন বোমা বলে উল্লেখ করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এটম বোমার রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পাঁচ মাস আগেই ফরাসী বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক বোমা ও শক্তি উৎপাদনের উপর পাঁচটি পেটেন্ট গ্রহণ করেছিল। অবশ্য এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ফরাসীদের উদ্দেশ্য ছিল মূলতঃ পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন—বোমা তৈরি নয়। বোমা তৈরির প্রশ্নটি তখনও জরুরী হয়ে ওঠে নি। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পরমাণুর রহস্য উন্মোচনের বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাথে যুক্ত হল একটি নূতন মাত্রা। পারমাণবিক বোমা তৈরীর সম্ভাবনা সেই নূতন মাত্রা।

banglainternet.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার দু'সপ্তাহের মধ্যেই হিটলার ঘোষণা করেছিলেন যে জার্মানীর হাতে এমন এক ভয়ঙ্কর গোপন অস্ত্র আছে যা অপ্রতিরোধ্য। হিটলারের এই হুমকীর পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ইউরেনিয়াম বোমার সম্ভাব্যতা ও কার্যকারীতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানোর জন্য লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার প্রধান এবং নিউট্রনের আবিষ্কারক বিখ্যাত ছাদউইককে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ছাদউইক তাঁর প্রতিবেদনে জানালেন যে, যথেষ্ট পরিমাণ ইউরেনিয়াম যোগাড় করতে পারলে এই বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব। তবে ইউরেনিয়ামের এই পরিমাণ ১ টন থেকে ৩০-৪০ টন হতে পারে। ইউরেনিয়ামের সঠিক পরিমাণ সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট জবাব

তিনি দিতে পারেন নি। তাঁর এই জবাবে ব্রিটিশ সরকার এই ভেবে আশ্বস্ত হলেন যে হিটলারের গোপন অস্ত্র আর যাই হোক ইউরেনিয়াম বোমা অন্তত নয়। ব্যাপারটা আমাদের সেই বাংলা প্রবাদের মত। চল্লিশ মণ ঘির যোগাড় হবে না, তাই রাধার নাচও দেখা যাবে না।

কিন্তু অবস্থা নূতন মোড় নিল ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে। অটো ফ্রিস এবং রুডলফ পিয়ারলস নামে দু'জন বাস্তহারা জার্মান বিজ্ঞানী বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। অটো ফ্রিসের নাম পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় তিনি ছিলেন ব্রিটেনে, কোপেনহাগেন থেকে এখানে তিনি বেড়াতে এসেছিলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তিনি ব্রিটেনে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বার্লিনবাসী পিয়ারলস ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে রকফেলার স্কলারশিপে কেম্ব্রিজে এসেছিলেন। বেশ কিছু সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর তিনি শেষ পর্যন্ত বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গাণিতিক পদার্থবিদ্যার প্রফেসর নিযুক্ত হন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার অল্প কিছুদিন আগে তিনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব লাভ করেছিলেন। ফিস ও পিয়ারলস হিসাব কষে দেখালেন যে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের বদলে যদি খাঁটি ইউরেনিয়াম-২৩৫ মৌল ব্যবহার করা হয় তাহলে বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য কয়েক পাউণ্ডই যথেষ্ট। তাঁদের প্রথম হিসাবে এই পরিমাণ ছিল এক পাউণ্ডেরও কম।

প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম থেকে পাউণ্ড খানেক ইউরেনিয়াম-২৩৫ আইসোটোপ পৃথকীকরণের প্রাযুক্তিক সমস্যা তখনও পর্যন্ত ছিল অতি দুরূহ। ইউরেনিয়াম বোমা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় আরও বহুবিধ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সমস্যার সমাধান ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকোতে প্রথম পার-

মাণবিক বোমার সফল পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা তাঁদের হিসাব নিকাশের শুদ্ধতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারেন নি। এ সব সত্ত্বেও ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর যে দিনে ফ্রিস ও পিয়ারলস তাঁদের হিসাব সম্পূর্ণ করলেন সেই দিনটাই পারমাণবিক শক্তি বিকাশের ইতিহাসে প্রকৃত সন্ধিক্ষণ। তাঁদের হিসাবের আগে সফলতার সম্ভাবনা ছিল এতই নগণ্য যে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে পারমাণবিক বোমা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও বৈষয়িক দিকগুলি খতিয়ে দেখাটা অর্থপূর্ণ মনে হয় নি। এই হিসাবের পর নৃশংস শত্রুর বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধরত কোন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এই মূল্যায়ন না করাটাই হয়ে উঠেছিল অসম্ভব।

ব্রিটিশ সরকার ইউরেনিয়াম বোমার সম্ভাব্যতা পরীক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন ছাদউইককে। ফ্রিস ও পিয়ারলস বহিরাগত। পিয়ারলস অবশ্য কিছুদিন পূর্বে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব লাভ করেছিলেন, কিন্তু ফ্রিস নিতান্তই একজন ভিন্‌দেশী। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক কাজ কর্মের ধারেকাছেও তাঁদের স্থান ছিল না। যে নাৎসী হিটলার তাঁদের ঘরছাড়া করেছে তাকে পরাভূত করার প্রচেষ্টায় তাঁরা সামিল হতে চান, কিন্তু তাঁদের এই আগ্রহের প্রতি সাড়া দেওয়ার কেউ নেই। ব্যাপারটা বড়ই নাজুক। হিটলারের অভ্যুদয়ের পর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিজ্ঞানী জার্মানী ত্যাগ করেছিলেন। এঁদের বেশির ভাগ ছিলেন ইহুদী পরমাণু বিজ্ঞানী। আইনস্টাইন, ঝিলার্ড, বিগনার, টেলর, ফার্মি, পিয়ারলস, ফ্রিস প্রমুখরা হচ্ছেন সেই সব দেশত্যাগী বিজ্ঞানী যাঁরা পারমাণবিক বোমা তৈরীতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এইসব বাস্তহারা বিজ্ঞানীরাই সর্বপ্রথম পারমাণবিক অস্ত্রের সম্ভাব্যতাকে ব্রিটিশ ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে জোরেসোরে তুলে ধরেছিলেন। কাজটা ছিল আত্মগ্লানিতে ভরা, কারণ তাঁরা তাঁদের

banglainternet.com

নূতন দেশের কাছে তখনও বিশ্বাসভাজন হতে পারেন নি।

সৌভাগ্যক্রমে সে সময় মার্ক অলিফ্যান্ট ছিলেন বার্মিংহাম বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার প্রফেসর। অলিফ্যান্টের পরামর্শে ও সক্রিয় সহযোগিতায় তাঁরা স্যার হেনরী টিজার্ডের কাছে চিঠি লিখলেন। সেই চিঠির সাথে পাঠালেন তাঁদের হিসাব নিকাশের দলিল। এই দলিলের একটির শিরোনাম ছিল "চরম বোমার গঠনের উপর : ইউ-রেনিয়ামে নিউক্লিয়ার সমপ্রতিক্রিয়াধারার ভিত্তিতে।" দ্বিতীয়টির শিরোনাম ছিল "তেজস্ক্রিয় চরম বোমার গুণাগুণের উপর স্মারক-লিপি।"

ভাগ্যের পরিহাস এই যে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে পারমাণ-বিক অস্ত্রের সম্ভাবনায় যিনি ছিলেন সবচেয়ে আস্থাহীন সেই টিজার্ডের কাছেই এসে পৌছাল ফ্রিস-পিয়ারলস এর স্মারকলিপি। এটি পাওয়ার পরও তাঁর সংশয় দূর হয় নি। কিন্তু এটা এমন একটা বিষয় যা তুচ্ছ করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি অলিফ্যান্টকে জানালেন যে অলিফ্যান্ট, থমসন ও ব্লাকেটকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে বিষয়টার সম্যক পর্যালোচনা করা যেতে পারে এবং তিনি ইচ্ছা করলে এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য অন্যদের নামও পেশ করতে পারেন।

থমসন কমিটি নামে পরিচিত এই কমিটি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের শরৎ-কালে তাদের প্রতিবেদন পেশ করল। এ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে যদিও বিষয়টা গুরুত্বের সাথে অনুসন্ধানযোগ্য তথাপি শুরু থেকেই এই প্রকল্পের প্রতি আস্থার তুলনায় তাঁদের সন্দেহের মাত্রাই ছিল অধিক। এই থমসন কমিটি পরে রূপ গ্রহণ করে 'মড কমিটি' হিসাবে (M. A. U. D—Ministry of Aireraft [Production] Uranium Development)।

দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও এই 'মড কমিটি'র সদস্যরা অবিচলিতভাবে পারমাণবিক বোমা তৈরী সংক্রান্ত কঠিন সমস্যাগুলি অবধারণ করেছিলেন। এই 'মড কমিটির' প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা কমিটি (Scientific Advisory Committee) প্রধান মন্ত্রীর কাছে যে সুপারিশ করেছিলেন তার ভিত্তিতেই চার্চিল পারমাণবিক বোমা তৈরীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই কমিটি দ্ব্যর্থহীন-ভাবে সুপারিশ করেছিল, 'এই কমিটির বিবেচনায় পারমাণবিক বোমা তৈরীর পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত এবং যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল অর্জনে এই বোমার উপযোগিতা অনস্বীকার্য।' এই সিদ্ধান্তের বলেই ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে যে নূতন সংস্থা গঠিত ছিল তার ছদ্মনাম (Code-name) 'টিউব-এলায়েজ, (Tube Alloys)।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারও পারমাণবিক শক্তি বা পারমাণবিক বোমার মত অনিশ্চিত এবং প্রকল্পিত বিষয়ের প্রতি খুব উৎসাহী ছিলেন বলে মনে হয় না। বিষয়টার প্রতি আমেরিকার টনক নড়ানোর কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন লিয়ো ঝিলার্ড নামে একজন বাস্তুহারা নবীন হাঙ্গেরীয় বিজ্ঞানী। ঝিলার্ড বার্লিনে পদার্থবিদ্যা অনুশীলন করেছিলেন। হিটলারের ক্ষমতা লাভের পর ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের শুরুতেই তিনি ইংল্যাণ্ডে অভিবাসন গ্রহণ করেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি আমেরিকায় চলে আসেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। যুক্তরাষ্ট্রের হাইড্রোজেন বোমার জনক হিসাবে খ্যাত এডওয়ার্ড টেলরও ছিলেন একজন বাস্তুহারা হাঙ্গেরীয় বিজ্ঞানী যিনি আমেরিকায় অভিবাসন গ্রহণ করেছিলেন। ঝিলার্ড ও টেলর উদ্যোগী হয়ে আইনস্টাইনের সাথে দেখা করেন এবং পারমাণবিক অস্ত্রের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে সচেতন করার জন্য

banglainternet.com

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে সরাসরি চিঠি লেখার জন্য আইনস্টাইনকে রাজী করান। আইনস্টাইন রুজভেল্টের কাছে তিনটি চিঠি লিখেছিলেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্টে লেখা চিঠি থেকে কিছু অংশ নীচে উদ্ধৃত হল :

"Sir,

Some recent work by E. Fermi and L. Szilard, which has been communicated to me in manuscript, leads me to expect that the element uranium may be turned into a new and important source of energy in the immediate future.....

In the course of the last four months it has been made probable—through the work of Joliot in France as well as Fermi and Szilard in America—that it may be possible to set up nuclear chain reactions in a large mass of uranium, by which vast amounts of power and large quantities of new radium like elements would be generated. Now it appears almost certain that this could be achieved in the immediate future.

This new phenomenon would also lead to the construction of bombs, and it is conceivable —though much less certain— that extremely powerful bombs of a new type may thus be constructed .....

Yours very truely
A. Einstein.

আইনস্টাইনের এই চিঠিটি অবশ্য সরাসরি রুজভেল্টের কাছে পৌছায় নি। আলেকজাণ্ডার স্যাকস (Sachs) নামে একজন অর্থনীতিবিদ ছিলেন রুজভেল্টের অন্যতম ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। স্যাকস আইনস্টাইনের চিঠিটি নিয়ে ১১ই অক্টোবর রুজভেল্টের সাথে দেখা করেন এবং পারমাণবিক শক্তির বিপজ্জনক দিকটি তাঁর গোচরে আনেন। নাৎসী জার্মানী পারমাণবিক বোমা বানাতে সক্ষম হলে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে চরম বিপদের কারণ হবে এটা রুজভেল্ট তৎক্ষণাৎ

উপলব্ধি করেছিলেন। রুজভেল্ট তখন তাঁর সচিব জেনারেল ওয়াটসনকে ডেকে নির্দেশ দেন যে ব্যাপারটায় ত্বরিৎ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। স্যাকস ওয়াটসনের সাথেই প্রেসিডেন্ট কক্ষ ত্যাগ করেন এবং তাঁর নিজের ও আইনস্টাইনের চিঠি প্রেসিডেন্টের কাছে রেখে যান।

প্রেসিডেন্টের নির্দেশের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করার উদ্দেশ্যে ওয়াটসন তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। ব্রিগস কমিটি নামে খ্যাত এই কমিটির প্রথম অধিবেশন ২১শে অক্টোবর শুরু হয়। ঝিলার্ড, বিগনার, টেলরসহ আরও অনেক বিজ্ঞানী এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। আইনস্টাইনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি এ সভায় উপস্থিত ছিলেন না।

আলেকজাণ্ডার স্যাকস-এর বিবরণ থেকে এই সভার আলোচনাধারার কিছু পরিচয় আমরা পেতে পারি :

Many Scientists were there who were not as concerned as [the] refugee Scientists, for ...the latter, in addition to their interestet in the advancement of science, were interested in the imperilled position of the United States and Civilization. They were infused with a concern, in the Quaker sense of the word, of devoted interest and responsibility. Many of the other scientists said : 'This is very remote, we have got to wait and see ; there are other lines of progress rather than the chain reaction that may be more attractive.' The discussion wondered all over side issues.

ব্রিগস কমিটি ১লা নভেম্বরের প্রতিবেদনে সুপারিশ করেছিল যে পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা উচিত এবং আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এ সংক্রান্ত যে সব কাজকর্ম চলছে তার সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন।

স্যাকস, ওয়াটসন এবং আইনস্টাইন ব্রিগস কমিটির এই সুপারিশের প্রতি প্রসন্ন হতে পারেন নি। কমিটির প্রতিবেদন বের হওয়ার আড়াই মাস পর ওয়াটসন উদ্যোগী হয়ে স্যাকস-এর সাথে যোগাযোগ করেন। স্যাকস প্রিন্সটনে আইনস্টাইনের সাথে দেখা করে কয়েকদফা আলাপ আলোচনা করেন। এই আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হয় যে আইনস্টাইন একটা চিঠি লিখবেন স্যাকসকে যেটা তিনি রুজভেল্টের কাছে নিয়ে যাবেন। আইনস্টাইনের এই চিঠিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

Since the outbreak of the war, interest in uranium has intensified in Germany. I have now learned that research there is being carried out in great secrecy and that it has been extended to another of the Kaiser wilhelm Institutes, the Institute of physics. The latter has been taken over by the Government and a group of physicists, under the leadership of C. F. Von Weizsacker who is now working there on uranium in collaboration with the Institute of Chemisrtry. The former director was sent away on a leave of absence, apparently for the duration of the war.

Should you think it advisable to relay this information to the President, please consider yourself free to do so. Will you be kind enough to let me know if you are taking any action in this direction ?

Dr Szilard has shown me the manuscript which he is sending to the physic Review (sic) in which he describes in detail a method of setting up a chain reaction in uranium. The papers will appear in print unless they are held up, and the question arises whether something aught to be done to withhold publication.

I have discussed with professor Wigner of princeton University the situation in the light of the information available. Dr Szilard will let you have a memorandum informing you of the progress made since October last year so that you will be able to take such action as you think in the circumstances advisabie. You will see that the line he has pursued is different and apparently more promising than the line pursued by M. joliot in France, about whose work you may have seen reports in the papers.

আইনস্টাইনের এই পত্রাঘাতেও 'হোয়াইট হাউজের' চৈতন্যোদয় হওয়ার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কোন ব্যক্তিই তখনও পর্যন্ত এই ইউরেনিয়াম সংক্রান্ত ব্যাপারটাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনতে পারেন নি। ব্রিগস কমিটি সুপারিশ করেছিল যে কলম্বিয়া থেকে ঝিলার্ড ও অন্যদের কাজের প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত এ সংক্রান্ত সমুদয় ব্যাপার মুলতবি থাকবে। স্যাকস-এর চাপেই শেষ পর্যন্ত রুজভেল্ট বিষয়টা বিবেচনা করার জন্য একটি সভা আহ্বানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সভায় আইনস্টাইনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি এই আমন্ত্রণ গ্রহণে তাঁর অপারগতা দুঃখের সাথে জানিয়ে যে চিঠিটা লিখেছিলেন সেটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামোর রূপরেখা এতে উল্লেখ করা হয়েছিল।

I am convinced as to the wisdom and urgency of creating the conditions under which that and related work can be carried out with greater speed and on a larger scale than hitherto.

I was interested in a suggestion made by Dr Sachs that the special Advisory committee supply names of persons to serve as a board of trustees for a non profit organisation which, with the approval of the governmental committee, could secure from governmental or private sources, or both, the necessary funds for carrying out the work.

banglainternet.com

Given such a framework and the necessary funds, it (the large scale experiments and exploration of practical application) could be carried out much faster than through a loose co-operation of university laboratories and government departments.

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল আইনস্টাইন ঐ চিঠিখানা লিখেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন বেশ জোরেসোরে চলছে। জার্মানী ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রমণ করেছে এবং নরওয়েতে তখন চলছে প্রচণ্ড লড়াই। পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতি আমেরিকার কৌতূহল বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও এই বৃদ্ধির মাত্রা ছিল সীমিত। কারণ তখনও পর্যন্ত সে বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে নি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রিটেনে পারমাণবিক বোমা তৈরির উদ্দেশ্যে 'টিউব-এলয়েজ' সংস্থা গঠিত হয় ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে। এটা গঠনের শুরু থেকেই এ ব্যাপারে ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে সহযোগিতা স্থাপিত হয়েছিল। স্যার হেনরী টিজার্ডের নেতৃত্বে প্রেরিত দূতরা ওয়াশিংটন পরিদর্শন করে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি আদানপ্রদানের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। প্রথমদিকে যুক্তরাষ্ট্রই এই সহযোগিতার প্রতি অধিক আগ্রহী ছিল। কারণ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর পর্যন্ত ব্রিটেন এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় যথেষ্ট এগিয়ে ছিল। এ সময়ের মধ্যে ব্রিটেন পারমাণবিক বোমা তৈরী কর্মসূচীর একটা খসড়া সম্পূর্ণ করেছিল। এই খসড়া থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের মধ্যে সামরিক দিক থেকে উপযোগী অস্ত্র তৈরির সম্ভাবনা উজ্জ্বল। যুক্তরাষ্ট্রের ব্রিগস কমিটি ও জাতীয় একাদেমির সুপারিশগুলি তখনও পর্যন্ত এতটা অগ্রসর হতে পারে নি। ব্রিটেনের 'মড কমিটির' প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই বুশ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে

বায়বীয় ব্যাপনের (gaseous diffusion) সাহায্যে পৃথকীকৃত ইউরেনিয়াম-২৩৫ মৌলের সাহায্যে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী সম্ভব।

পারমাণবিক বোমার সম্ভাব্যতায় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের আস্থা স্থাপনের মুহূর্ত থেকেই পরিস্থিতির দ্রুত পরিবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। এ সংক্রান্ত লক্ষ্য ও কার্যক্রম বিবেচনার জন্য প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়ালেস, সমরমন্ত্রী স্টিমসন, সেনাধ্যক্ষ জেনারেল মার্শাল এবং বুশ ও কোনান্টকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিষয়টা আলোচনার জন্য রুজভেল্ট চার্চিলকে একটি পত্র লেখেন। মড রিপোর্ট পাওয়ার দু'সপ্তাহের মধ্যেই ব্রিটেনে গিয়ে সরেজমিনে ব্রিটিশ প্রকল্পের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য জর্জ পেগরাম এবং হ্যারল্ড উরেকে (Harold Urey) সেখানে পাঠানো হয়েছিল। ২৭শে অক্টোবর তাঁরা লণ্ডন পৌঁছান এবং এপ্পলটন, একারস (Akers) এবং পেরিনের সাথে দেখা করেন। ব্রিটিশ প্রকল্পের পূর্ণ বিবরণ তাঁদের জানানো হয়। লিভারপুলে গত দু' বছরের কাজকর্ম সম্বন্ধে চাডউইক তাঁদের অবহিত করেন। ফ্রান্স থেকে আগত জোলিয়ো কুরির সহযোগী হলবান ও কোয়ারস্কির (Halban, Kowarski) সাথে কেম্ব্রিজে আলাপ করে তাঁরা নিশ্চিত হন যে পর্যাপ্ত সরঞ্জামের অভাবেই তাঁরা স্বয়ংভর সমপ্রতিক্রিয়াধারা সৃষ্টি করতে সমর্থ হন নি। পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প এবং প্লুটোনিয়ামের উপর একটি প্রাযুক্তিক স্মারকলিপি হলবান তাঁদের উপহার দেন। ভারী পানির আবিষ্কারক উরেকে এক গ্যালন ভারী পানি উপহার দেওয়া হয় কেম্ব্রিজে।

দু'দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে যখন জ্ঞানের এই বিনিময় চলছিল তখন লণ্ডনে যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক সংযোগাধিকারিক রুজভেল্টের সহযোগিতার ধারণার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন। "মড কমিটির

banglainternet.com

অধীনে এবং আমাদের দেশে ডাঃ বুশের সংস্থার অধীনে যে বিষয়টার গবেষণা চলছে তার বিস্তৃত প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করা, এমন কি যৌথ-ভাবে পরিচালনা করা আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। দু'পক্ষের সনাক্তকরণের জন্য বিষয়টাকে আমরা 'মেসন' (Mayson) নামে অভিহিত করতে পারি।

যুক্তরাষ্ট্রের এই গলাগলি ভাব নেহাত অকারণ ছিল না। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর পর্যন্ত ব্রিটেন ছিল দাতার ভূমিকায়, যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ছিল অনেকটা খাতকের ভূমিকায়। কিন্তু ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালের মধ্যেই দু' দেশের অবস্থায় নাটকীয় পরিবর্তন হল। যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক বোমা তৈরিকে সামরিক ভিত্তিতে গ্রহণ করে মানহাট্টান প্রকল্প সৃষ্টি করল এবং জেনারেল গ্রোভসকে এর পরি-চালক নিযুক্ত করল। ব্রিটেনের প্রযুক্তির জ্ঞান সরবরাহের জন্য রুজভেল্ট চার্চিলকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র প্রকল্পে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়োজিত মূলধন ব্রিটেনের ধ্যানধারণাকেও বহুদূর ছাড়িয়ে গেল। ইউরেনিয়াম-২৩৫ মৌল পৃথকীকরণে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সেন্ট্রিফিউজ প্লান্টের জন্য ৩৮ মিলিয়ন ডলার এবং বায়বীয়-ব্যাপন প্লান্টের জন্য প্রথম বছরে দু' মিলিয়ন ডলার এবং পরবর্তী সময়ের জন্য সীমাহীন অর্থ, তড়িচ্চুম্বকীয় পৃথকীকরণ প্লান্টের জন্য ১২ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হল। উপরন্তু এক বা একাধিক প্লুটোনিয়াম গাদা (piles) তৈরির জন্য প্রতিটি গাদার জন্য ২৫ মিলিয়ন ডলার এবং ভারী পানি উৎপাদন প্লান্টের জন্য ২·৮ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হল। পারমাণবিক বোমা তৈরির প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার পূর্ণ মাত্রা যখন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল তখন ব্রিটেনের শক্তি ও সাধ্যের সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়ে উঠল। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের শুরু থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে

উঠেছিল যে পারমাণবিক বোমা প্রকল্পে যুক্তরাষ্ট্রের উপর ভর করেই ব্রিটেনকে চলতে হবে, এর বিপরীতটা আর সম্ভব নয়। এ সময় থেকেই দু'দেশের কর্মকর্তাদের মধ্যে শুরু হল পারস্পরিক সন্দেহের প্রতিযোগিতা। আর এ সন্দেহের বাস্তব কারণও ছিল। ব্রিটেনের আত্মসম্মান আহত হল যখন সে উপলব্ধি করল যে যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের জ্ঞান গ্রহণের জন্য যতটা উদগ্রীব, তার নিজের কাজকর্ম খোলাখুলি ব্রিটেনের গোচরে আনতে ঠিক ততখানিই দ্বিধাগ্রস্ত। যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা হল যে পারমাণবিক বোমার চেয়ে যুদ্ধোত্তর শিল্পায়নের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হওয়াই ব্রিটে-নের গূঢ় অভিপ্রায়। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মের শেষভাগে ব্রিটেনের এ রকম আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে এই প্রতিযোগিতার অবসান ঘটল। চার্চিল ও রুজভেল্ট এ বিষয়ে যে চুক্তি সই করলেন সেই 'কুইবেক চুক্তি' অনুসারে :

" . . যুদ্ধোত্তর শিল্প ও বাণিজ্যিক কোন সুবিধাদি অর্জিত হলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের নির্দেশক্রমে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে সেগুলি ভাগ বাঁটোয়ারা করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে এবং পৃথিবীর অর্থনৈতিক মঙ্গলের স্বার্থে যেটুকু সুষ্ঠু বিবেচনা করবেন তার বাইরে এইসব শিল্প ও বাণিজ্যিক সুবিধাগুলির উপর সব রকমের অধিকার ব্রিটেনের প্রধান-মন্ত্রী পরিত্যাগ করছেন।"

এভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুই মিত্র ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় মিত্র রাশিয়াকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে পারমাণবিক বোমা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করল। অবশ্য এটা জানা কথা যে ব্রিটেন কিংবা যুক্তরাষ্ট্র কেউই বলশেভিক রাশিয়াকে খুব একটা সুনজরে দেখে না। অতএব তাঁদের এই আচরণ অবাঞ্ছনীয় হলেও অপ্রত্যাশিত ছিল না।

banglainternet.com

তৃতীয় অধ্যায়

একটি প্রক্ষেপণ—ভারী পানির কাহিনী

ইদানিং পত্র পত্রিকায় 'ভারী পানি' নামক একটি বস্তুর উল্লেখ মাঝে মধ্যে চোখে পড়ে। কান টানলে যেমন মাথা এসে পড়ে, পারমাণবিক অস্ত্র সংক্রান্ত কোন আলোচনায় তেমনি 'ভারী পানির' প্রসঙ্গ এসে পড়বেই। পানি আমাদের অতি পরিচিত বস্তু, আর এই নদী নালার দেশে এমন কিছু দুর্লভ বস্তুও নয়। কিন্তু এই 'ভারী পানি' বস্তুটি যেমন আমাদের অপরিচিত ঠিক তেমনি অতি দুর্লভ। আসলে জিনিসটা কি?

আমরা জানি যে পানি এমন একটি যৌগ যার একটি অণুতে আছে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু আর একটি অক্সিজেন পরমাণু। এর আগে ইউরেনিয়াম মৌলের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে ইউরেনিয়াম তিনটি আইসোটোপীয় অবস্থায় বিদ্যমান—ইউরেনিয়াম ২৩৪, ইউরেনিয়াম ২৩৫, ইউরেনিয়াম ২৩৮। হাইড্রোজেন মৌল দুইটি আইসোটোপীয় অবস্থায় প্রকৃতিতে বিরাজ করে—প্রোটিয়াম, ডয়টেরিয়াম। প্রোটিয়ামের ভরসংখ্যা ১·০০৭৮২ u। প্রকৃতিতে বিদ্যমান হাইড্রোজেনের শতকরা ৯৯·৯৮৫ ভাগ এই প্রোটিয়াম। কিন্তু শতকরা মাত্র ০·০১৫ ভাগ হাইড্রোজেন বিরাজ করে যে আইসোটোপীয় অবস্থায় তার নাম ডয়টেরিয়াম এবং তার ভরসংখ্যা ২·০১৪০ u। সুতরাং প্রোটিয়ামকে আমরা হাল্কা হাইড্রোজেন এবং ডয়টেরিয়ামকে ভারী হাইড্রোজেন বলতে পারি। আমাদের অতি পরিচিত পানির অণুতে আছে প্রোটিয়াম আর অক্সিজেন। কিন্তু আমরা যে ভারী পানির উল্লেখ করেছি সেই পদার্থটির অণুতে আছে ডয়টেরিয়াম ও অক্সিজেন। এ জন্যই তাকে বলা হয় ভারী পানি।

পারমাণবিক শক্তি কিংবা অস্ত্র তৈরিতে একটি মহার্ঘ উপাদান এই ভারী পানি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক বছর আগে থেকে পারমাণবিক শক্তি বা অস্ত্র তৈরির উদ্দেশ্যে চারটি সংস্থা গবেষণা চালাচ্ছিল। ব্রিটেনের থমসন কমিটি, ফ্রান্সের ফ্রেডারিক জোয়ালিয়োর নেতৃত্বে কলেজ ডি ফ্রান্স দল, জার্মান দল এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্রিগস কমিটি।

পারমাণবিক শক্তি ও বোমা তৈরির উদ্দেশ্যে পরিচালিত গবেষণায় এই চারটি দলের মধ্যে ফরাসীরাই ছিল অগ্রগামী। ফরাসী দল ইতিমধ্যেই গ্রাফাইটকে মডারেটর হিসাবে ব্যবহার করে যে পরীক্ষা চালিয়েছিল তা থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয় নি। সুতরাং তারা ভারী পানিকে নিয়ন্ত্রক বা মডারেটর হিসাবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। ১৯৪০ সালের প্রথম দিকে একমাত্র নরওয়ের রুকানে (Rjukan) শিল্প মাত্রায় ভারী পানি তৈরি হচ্ছিল।

ফরাসী বিজ্ঞানীরা ফরাসী সমরাস্ত্র মন্ত্রী দুত্রিকে (Dautry) এটা বোঝাতে সমর্থ হলেন যে নরওয়ের ভারী পানির ভাণ্ডার তাদের তাঁবে আনা একান্ত জরুরী। এ ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণ পর্বেই ফরাসীরা যে সংবাদ পেল তা রীতিমত ভীতিকর। গোয়েন্দা সূত্রে তারা জানতে পারল জার্মানরা যে শুধু নরওয়ে কারখানার গোটা মজুদ ভাণ্ডার কেনার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে তাই নয় তারা আরও বেশি পরিমাণে এবং নিয়মিত ভারী পানি সরবরাহের জন্য তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

banglainternet.com

এই রকম জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলায় এগিয়ে এলেন লেফ-টেনান্ট জ্যাকুস আলিয়ার নামে একজন তরুণ ফরাসী। আলিয়ার ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী। তাঁকে ফরাসী গোয়েন্দা সংস্থার একটি বিশেষ শাখায় একজন অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। জার্মানদের পারমাণবিক গবেষণা সম্বন্ধে ফরাসীদের জ্ঞাত সব কিছুই আলিয়ার সমরাস্ত্র মন্ত্রীকে ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু এই জ্ঞান ছাড়াও তাঁর যে গুণটি ছিল আরও গুরুত্বপূর্ণ তা হল তিনি যে ব্যাঙ্কের সদস্য ছিলেন সেই ব্যাঙ্কের বিরাট আর্থিক লগ্নি ছিল নোর্স্ক হাইড্রো কোম্পানীতে। আর এই হাইড্রো কোম্পানীই ছিল রুকান ভারী পানি কারখানার মালিক।

১৯৪০ সালের মার্চের প্রথম দিকে আলিয়ার অসলোর উদ্দেশ্যে প্যারিস ত্যাগ করলেন। পথে স্টকহল্ম থেকে তিনি তাঁদের গোয়েন্দা সংস্থার তিনজন সদস্যকে সহযোগী হিসাবে সাথে নিলেন। তাঁদের নাম ক্যাপ্টেন মুলার, লেফটেনান্ট মসি এবং এম, ডেমার্স। নোর্স্ক হাইড্রো কারখানাটির মহাপরিচালক ছিলেন ডক্টর এক্সেল উবার্ট (Dr. Axel Aubert)। অসলোতে পৌঁছেই তিনি সত্বর উবার্টের সাথে সাক্ষাত করলেন। আলিয়ারের আগেই জার্মানরা উবার্টের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। কিন্তু উবার্ট যখন জার্মানদের কাছ থেকে জানতে চান যে কি উদ্দেশ্যে তাদের ভারী পানির প্রয়োজন তখন তাদের জবাবগুলি শুনে তার মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল।

জার্মানরা আগে থেকে চেষ্টা করেও যা করায়ত্ত করতে পারে নি আলিয়ার তাঁর বুদ্ধি ও কুশলতায় তা করায়ত্ত করতে সমর্থ হলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁরা যে চুক্তিতে সই করলেন তার বলে সে সময় পর্যন্ত মজুদ ভাণ্ডার একশত পঁচাশি কিলোগ্রাম ভারী পানি ফরাসীদের করায়ত্ত হল এবং এই কারখানার যাবতীয় উৎপাদনের

উপর ফরাসীদের দাবীর পূর্বিতা স্থাপিত হল।

প্রথমে পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে ভারী পানির ছাব্বিশটি পাত্র সাবমেরিন যোগে ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু পরে এটা অবাস্তব বলে মনে হল। অনেক কৌশলে জার্মানদের চোখে ধুলো দিয়ে আলিয়ার ও তাঁর সহকর্মীরা ভারী পানি ভর্তি ছাব্বিশটি পাত্র বিমানে করে স্কটল্যাণ্ডের এবিনবরায় নিয়ে এলেন। সেখান থেকে এগুলি লণ্ডনে চালান দেওয়া হল। ১৬ই মার্চে আলিয়ার ও তাঁর সহকর্মীরা প্যারিসে ফিরে এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন পৃথিবীতে সে সময়কার মজুদ সমুদয় ভারী পানির ভাণ্ডার। কলেজ ডি ফ্রান্সের ভূগর্ভস্থ গুদামে সেগুলি নিরাপদে রক্ষিত হল। হাওয়াই হামলা থেকে রক্ষার জন্য এই গুদামের উপর এমন একটি আচ্ছাদন নির্মিত হল যাতে এক হাজার পাউণ্ড বোমার সরাসরি আঘাতেও তা বিধ্বস্ত না হয়।

১৯৪০ সালের ১০ই মে জার্মানী ফ্রান্স আক্রমণ করল। জার্মানরা ফ্রান্সের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ক্ষিপ্রতার সাথে অগ্রসর হতে লাগল। ফরাসী সরকারের পতন আসন্ন। পরাজয় যখন শুধু অনিবার্যই নয় বরং খুবই সন্নিকট সেই পরিস্থিতিতে ফরাসী সমরাস্ত্র-মন্ত্রী ছত্রি নানা ঝামেলার মধ্যেও এই মহার্ঘ ভারী পানির কথা বিস্মৃত হলেন না। পরাজয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাঁর মনে হল এ সেই পদার্থ যা একদিন অবস্থান্তরে ফরাসীদের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে। তিনি জোলিয়ো কুরিকে নির্দেশ দিলেন যে এগুলি যেন শত্রুর করায়ত্ত না হয় এমন ব্যবস্থা নিতে। জোলিয়ো কুরি হল-বানকে নির্দেশ দিলেন সেগুলি প্রথমে মধ্য ফ্রান্সের মন্ট দোরে (Mont-Dore) নিয়ে যেতে, এবং সেখান থেকে পরে ক্লেয়ারমন্ট ফেরাণ্ডে নিয়ে ব্যাঙ্ক ডি ফ্রান্সের সিন্দুকে সুরক্ষিত রাখতে।

banglainternet.com

ভারী পানির পাত্রগুলি, কিছু রেডিয়াম এবং মূল্যবান দলিলপত্র মোটর গাড়িতে তুলে হলবান সপরিবারে যাত্রা শুরু করলেন। স্ত্রী এবং এক বছরের মেয়েকে সামনের সিটে বসালেন, গবেষণাগারের এক গ্রাম রেডিয়াম রাখলেন গাড়ির একেবারে পেছনে এবং রেডিয়ামের সম্ভাব্য বিকিরণ কমানোর উদ্দেশ্যে ভারী পানির পাত্রগুলিকে রাখলেন তাদের মাঝখানে।

হলবান ফরাসী বলতেন জার্মান উচ্চারণ ভঙ্গিতে। মন্ট দোরে পৌঁছানোর পর তাঁর এই উচ্চারণভঙ্গি বেশ সমস্যার সৃষ্টি করেছিল এবং অনেক বাকবিতণ্ডার পর শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাষ্যের সত্যতায় আস্থা স্থাপন করে ভারী পানির পাত্রগুলিকে শহরের মহিলা কারাগারে রাখার জন্য তাঁকে অনুমতি দেওয়া হল।

পরদিন সকালে অধিকতর নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে হলবান কাছাকাছি রিয়মে পৌঁছালেন। সেখানে একটি ছোট্ট বাসায় হলবান তাঁর গবেষণাগার তৈরী করে ফেললেন। সামরিক ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্যে তিনি প্রয়োজনীয় ছোটখাট যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক করে নিলেন। তাঁর আসল প্রয়োজন ছিল প্রবহমান জলধারার। রান্নাঘরে এবং খানাগারে এই জলধারার ব্যবস্থা ছিল। এই রকম সাদাসিধা পরিবেশে গবেষণা শুরু করার প্রস্তুতি চলতে লাগল। যে গবেষণার মাধ্যমে ফ্রান্স সন্ধান পাবে সীমাহীন শক্তির সেই গবেষণাকে কি ফেলে রাখা যায়। জার্মানদের অভিযান কোন এক সময় প্রতিরুদ্ধ হবেই, যেমনটি ঘটেছিল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে।

কলেজ-ডি-ফ্রান্সের জোলিয়ো কুরির দলের প্রায় সব বিজ্ঞানীই উপস্থিত হয়েছিলেন এই স্থানটিতে। গবেষণা শুরু করার জন্য সব কিছু প্রস্তুত। একটি ছোটখাটো আনুষ্ঠানিক ভোজ সভার আয়োজন করা হয়েছিল যেখানে কাজকর্মের ব্যাপারে সবকিছু আলোচনা করে

নেওয়া হবে। ভোজ শুরু হওয়ার ঠিক পূর্বে বাসার সামনে এসে থামলো একটা ছোট্ট সিমকা মোটরগাড়ি। গাড়ি থেকে বের হলেন আলিয়ার। আলিয়ার জানালেন যে শত্রু এখন অগ্রসর হচ্ছে এবং ফরাসী সরকার নির্দেশ দিয়েছেন যে ভারী পানি ভিন্নদেশে সরাতে হবে। তিনি জানালেন যে গবেষণা আর চালানো যাবে না, ক্লেয়ার-মন্ট-ফেরাণ্ডে তো নয়ই।

কোন সামরিক আদেশ ছাড়া ভারী পানির পাত্রগুলি হস্তান্তর করতে প্রথমে অস্বীকার করলেন রিয়ম জেলের অধিকর্তা। আলিয়ার তাঁর রিভলবার টেনে বার করলেন এবং বললেন যে এটাই তাঁর কর্তৃত্ব। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েকজন কয়েদীকে আদেশ দেওয়া হল ভারী পানির পাত্রগুলিকে বাইরে অপেক্ষমান গাড়িতে তুলে দেওয়ার জন্য।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে বারডো বন্দর দিয়ে এই অপসারণ সম্পন্ন হওয়ার কথা। বন্দরে পৌঁছে হলবান ও কাউরস্কি দেখতে পেলেন একটা সাদাসিধা ব্রিটিশ কয়লাবাহক জাহাজ, নাম ব্রুমপার্ক। এই জাহাজে তাঁদের পরিচয় হল সাফোকের শেরিফ আর্লের সাথে। দুঃসাহসী ও অমিত বিক্রমশীল এই সাফোক ছিলেন এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র। ফ্রান্সের সাথে সংযোগ অফিসার হিসাবে তিনি কাজ করেছিলেন। কতিপয় বিরল যন্ত্রচালিত ছেদক (Machine tool), পঁচিশ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং মূল্যের শিল্পসংক্রান্ত হীরক, জার্মানদের হাতে সমর্পন করা যায় না এমন মহামূল্যবান পঞ্চাশজন ফরাসী বিজ্ঞানী এবং ভারী পানির ঐ পাত্রগুলি উদ্ধার কার্যে তিনি এখন নিয়োজিত ছিলেন। যন্ত্রপাতি, মালমশলা এবং বিজ্ঞানীরা পরিবারসহ জাহাজ না ওঠা পর্যন্ত সাফোক-জাহাজের নাবিকদের অকাতরে মদ্য পান করিয়ে মাতাল অবস্থায় রেখেছিলেন। জাহাজটি ছিল

banglainternet.com

আসলে কয়লা বহনের জাহাজ। সাফোকের সারা মুখে ছিলো কয়েক-দিনের না কামানো খোচা খোচা দাঁড়ি, অনেকেই সমুদ্র পীড়ায় কাতর, আর জাহাজের আরোহীদের মধ্যে ছিল পঁচিশ জন মহিলা। সাফোক তাদের সমুদ্রপীড়া দূর করার জন্য স্যাম্পেন ঢেলে ঢেলে খাওয়াচ্ছিলেন। পুরা একদিন জাহাজটি বন্দরে ছিল, বন্দরে বোমা বর্ষিত হচ্ছিল অবিরাম।

ব্রুমপার্ক জাহাজটি বন্দর ত্যাগ করার পর জোলিয়ো কুরি বারডৌ পৌছান। তিনি ফ্রান্সেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং পরে প্রতিরোধ আন্দোলনের একজন দুর্দান্ত নেতা হয়ে উঠেছিলেন। যাহোক জোলিয়ো কুরি না আসায় ভারী পানির দায়িত্ব পড়ল হল-বান ও কাউরস্কির উপর। কারণ এই দুজনই ছিলেন কলেজ-ডি-ফ্রান্সের বিজ্ঞানী। তরায় সাফকের তত্ত্বাবধানে একটি কাঠের ভেলা তৈরী করা হল। হীরকের বাণ্ডিল এবং ভারী পানির পাত্রগুলিকে দড়ি দিয়ে এঁটে বাঁধা হলো। ব্রুমপার্ক যদি নিমজ্জিত হয়, এবং সে সম্ভাবনা খুব অহেতুক ছিল না, তাহলে মালপত্রসমেত ভেলাটিকে জাহাজ থেকে মুক্ত করে ভাসিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে রক্ষা করার সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অনেক বিপদ আপদ কাটিয়ে চার দিন পর ব্রুমপার্ক কর্ণওয়ালের দক্ষিণ কিনারায় এসে নিরাপদে নোঙর ফেললো। পরে এই ভারী পানি এবং বিজ্ঞানীরা লণ্ডন পৌছালেন।

পনেরটি এলুমিনিয়াম ও এগারটি টিনের পাত্রে ভরা একশ' আশি কিলোগ্রাম ভারী পানি প্রথমে লণ্ডনের ওয়ার্মউড কয়েদখানায় মজুদ রাখা হল। পরে এই সমুদয় পাত্র বাকিংহাম প্রাসাদ উইনজ্যার ক্যাসেলের ভূগর্ভস্থ গুদামে স্থানান্তরিত করা হল।

ভারী পানির এই প্রক্ষিপ্ত কাহিনীটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে ফ্রান্স যখন আসন্ন পরাজয়ের একেবারে মুখোমুখি তখনও

তার নেতারা বিস্মৃত হন নি যে ফ্রান্সের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি তার জন্য পঞ্চাশেক বিজ্ঞানী আর এই ভারী পানির ভাণ্ডার। ঘোরতর জাতীয় বিপর্যয়ের মধ্যেও তাঁরা তাঁদের উপলব্ধিতে অটুট ছিলেন যে যুদ্ধ ও শান্তি এই উভয় পরিস্থিতিতেই জাতীয় সাফল্যের চাবিকাঠি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। আর তাই তাঁরা সময়মত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন যাতে এই চাবিটি শত্রুর করায়ত্ত না হয়।

banglainternet.com

চতুর্থ অধ্যায়

ট্রিনিটি—প্রথম পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা

পারমাণবিক বোমা নির্মাণের উদ্দেশ্যে ব্রিটেনের 'টিউব-এলয়েজ' সংস্থা গঠিত হয় ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে। আর ঐ একই উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের 'ম্যানহাট্টান প্রকল্প' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে। এই যে এক বছরের ব্যবধান তার মধ্যে বিশ্ব পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র মিত্র শক্তির অন্যতম শরিক হিসাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আসরে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধে যোগ দেওয়ার আগে পরমাণু অস্ত্র সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং অধিকাংশ আমেরিকান বিজ্ঞানীদের মনোভাব ছিল 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' এই প্রবাদ বাক্যের মত। কিন্তু হঠাৎ পার্ল হারবারে জাপানীদের কাছে পর্যুদস্ত হওয়ার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মনোভাবে আমূল পরিবর্তন ঘটে। তারা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির প্রকল্পকে সামরিক ভিত্তিতে গ্রহণ করে এবং এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ নিয়োগ করে। যে তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক জটিলতার দরুণ কয়েক বছর পূর্বেও পরমাণু অস্ত্র তৈরির সম্ভাবনায় অনেক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীও ছিলেন আস্থাহীন ইতিমধ্যে সেই পরিস্থিতির দ্রুত রূপান্তর ঘটেছিল। যে সব বাধা বিপত্তির কারণে এই সব প্রাথমিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল ম্যানহাট্টান প্রকল্প শুরুর আগেই সেই সব বাধা বিপত্তির নিরসন হয়েছিল। সুতরাং পরমাণু অস্ত্র তৈরিতে সাফল্য লাভের জন্য তখন যে দুটি প্রয়োজন মুখ্য হয়ে উঠেছিল সেগুলো হল দৃঢ় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও পর্যাপ্ত সম্পদ সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান। ব্রিটিশ সরকার এই দুটি প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হয় নি। ব্রিটেন যা পারে নি, যুক্তরাষ্ট্র সরকার উৎসাহের সাথেই সেই কাজটি সম্পন্ন করলেন। আর এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট হল সেই বিখ্যাত (মতান্তরে কুখ্যাত) প্রকল্প যার নাম 'ম্যানহাট্টান প্রকল্প'। অনেক কাঠ খড় পোড়ানোর পর অবশেষে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর প্রস্তুতি পর্ব শেষ হল। এখন প্রয়োজন শুধু সরেজমিনে পরীক্ষার। প্রথম পারমাণবিক বোমা পরীক্ষার ছদ্মনাম দেওয়া হল 'ট্রিনিটি।' এই নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে ম্যানহাট্টান প্রকল্পের কর্ণধার জেনারেল গ্রোভস ও তাঁর উপদেষ্টাদের মানবিক অন্য যে সব গুণের ঘাটতি থাক রসবোধের অভাব ছিল না। খৃষ্টান ধর্মমতে ট্রিনিটি (Trinity) শব্দের অর্থ পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার তিন রূপ সমন্বিত ঈশ্বর।

লস আলামাস থেকে ১২০ মাইল দূরে অবস্থিত আলামোগোরডো বিমান বেসকে এই পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত স্থান হিসাবে অনুমোদন করলেন জেনারেল গ্রোভস। যদিও নিরাপত্তার কারণে এই স্থানটি ছিল যথেষ্ট দূরবর্তী এবং বিচ্ছিন্ন, তথাপি ইতরজনের বিভ্রান্তির জন্য একটি বানোয়াট কাহিনী প্রচার করা হল যে এই বিমান বেস-এ সংরক্ষিত জিনিষপত্রে এক অপ্রত্যাশিত বিস্ফোরণ ঘটে গেছে।

প্রথম পারমাণবিক বোমার জন্য প্রয়োজনীয় প্লুটোনিয়াম জুলাই মাসের প্রথমেই লস এলামসে পৌঁছেছিল। ১২ই জুলাই দুপুরে ঐ মহামূল্যবান বস্তুটিকে আলামোগোরডোতে স্থানান্তর করা হল। কয়েক ঘণ্টা পরেই অপারমাণবিক অংশসমূহকে বহন করে এক সারি গাড়ির মিছিল গন্তব্য স্থলের দিকে রওনা হল। গন্তব্য স্থানটি হল

banglainternet.com

সেই জনমানবশূন্য মরু অঞ্চল যেখানে এই উদ্দেশ্যে একটি ১০০ ফুট ধাতব টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছিল। এই টাওয়ারের গোড়ায় স্থাপিত একটি তাঁবুর মধ্যে পরদিন ঐ সব বিচ্ছিন্ন অংশসমূহকে যথা-যথভাবে সন্নিবিষ্ট করা হল। সন্ধ্যার মধ্যেই সব কিছুর প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হল, বাকি রইল শুধু বিস্ফোরক সলতেটি ঢোকানো। পরের দিন সকালে বোমাটিকে টাওয়ারের উপর একটি প্ল্যাটফর্মে উত্তোলন করা হল। বিকাল ৫টার মধ্যে সব প্রস্তুতি সমাপ্ত হল।

পরীক্ষার সময় নির্ধারিত হল ১৬ই জুলাই—সূর্যোদয়ের সাড়ে চার ঘণ্টা পূর্বে অর্থাৎ রাত আড়াইটার সময়। ১৫ই জুলাই মধ্য-রাত্রির কিছু পূর্বে এই সময় পরিবর্তন করা হয়। স্থির হল সকাল ৪ টায় এই পরীক্ষা সংঘটিত হবে। ১৫ই জুলাই রাত্রিটা ছিল মেঘাচ্ছন্ন, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল, সামান্য কয়েকটি তারা মিটমিট করে জ্বলছিল এবং দূর থেকে বাতাসে ভেসে আসছিল মেঘ গর্জন। রাত তিনটার সময় গ্রোভস এবং ওপেনহাইমার লক্ষ্য করলেন যে তারাদের জ্যোতি বৃদ্ধি পেয়েছে। পরীক্ষার সময় তাঁরা আবারও পিছিয়ে দিলেন। সময় চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হল সকাল সাড়ে পাঁচটা—অর্থাৎ সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা আগে।

যে পাঁচজন লোক টাওয়ারে বসে শেষ মুহূর্তের কাজগুলি সমাধা করছিলেন তাঁদেরকে সকাল পাঁচটায় স্থান ত্যাগ করার জন্য আদেশ দেওয়া হল। প্রত্যেকেই তাঁরা নেমে এসে নিজ নিজ গাড়িতে চড়ে বিপজ্জনক এলাকা ত্যাগ করলেন। টাওয়ার এবং তার উপরে অবস্থিত বস্তুটি আলোকিত করার জন্য বিরাট ফ্লাডলাইট জ্বালানো হল।

টাওয়ার থেকে মাত্র সতের হাজার গজ দূরে অবস্থিত মূল শিবির। জেনারেল গ্রোভস এই শিবিরে ফিরে আসার দশ মিনিট পর চূড়ান্ত গণনা শুরু হল। সময়ের ব্যবধান যতই কমতে লাগল,

মিনিট থেকে এসে সেকেণ্ডে এসে ঠেকল, আশঙ্কা-উদ্বেগের পরিমাণ সেই তালে লাফিয়ে লাফিয়ে দ্রুত লয়ে বাড়তে লাগল। নিমেষের মধ্যে যা ঘটতে যাচ্ছে তার প্রলঙ্করের সম্ভাবনা সম্বন্ধে এই শিবিরের সকলেই সচেতন ছিলেন। বিজ্ঞানীরা অনুভব করছিলেন যে তাঁদের হিসাব নিকাস সঠিক, আর বোমাটির বিস্ফোরণ তাই অবধারিত। কিন্তু একই সাথে প্রত্যেকের মনের গহনে বেশ জোরালো সন্দেহও লুকিয়ে ছিল।

উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল ওপেনহাই-মারকে। রেডিয়োতে গণনা যখন ১০, ৯, ৮, · এ ভাবে শূন্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন একটি খুঁটিতে ভর করে তিনি কাঠের মত নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

নিস্তব্ধ ঘরটিতে 'এখন' শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথেই কয়েকটি মধ্যাহ্ন সূর্যের আলোর সমান দীপ্তিতে বিদ্যুৎ চমকের মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো গোটা মরুভূমি, প্রায় দু'শ মাইল পর্যন্ত দেখা গেল জলন্ত বহ্নিশিখার আলো। এটার রঙ সোনালী, রক্তবর্ণ, বেগুনী, ধূসর এবং নীল। এই আলো নিকটবর্তী পর্বতমালার প্রতিটি শৃঙ্গ, শৈলশিরা এবং তুষারস্তূপের ফাটলকে এমন সুস্পষ্ট ও সুষমার সাথে প্রদীপ্ত করেছিল যা অবর্ণনীয়। প্রত্যক্ষ দর্শনেই যা শুধু কল্পনীয়। মহান কবিরা যে সৌন্দর্যের শুধু স্বপ্ন দেখেছিলেন, এ সেই সৌন্দর্য। কিন্তু তাঁদের বর্ণনায় এ সৌন্দর্যের রূপ ধরা পড়ে নি।

পৃথিবীর এই প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ করতে যে সব বিজ্ঞানীরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সবারই মোটামুটি একই ধরণের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। ওপেনহাইমার স্মৃতিচারণ করেছেন, "উপস্থিত ব্যক্তিদের কেউ কেউ হেসেছিলেন, কয়েকজন কেঁদে ফেলেছিলেন, তবে বেশিরভাগ ছিলেন স্তব্ধ।' এই স্মৃতিচারণে তিনি উল্লেখ

banglainternet.com

করেছেন 'আমার মনের মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠল ভগবত গীতার একটি শ্লোক—যেখানে শ্রীকৃষ্ণ রাজপুত্র যুধিষ্ঠিরকে তার কর্তব্যে রত হতে উপদেশ দিচ্ছেন এবং বলছেন যে "আমি প্রলয়ের রূপ ধারণ করেছি, আমি বিশ্ববিনাশকারী। আমার মনে হয় উপস্থিত সকলেরই কম-বেশি এ ধরণের অনুভূতি হয়েছিল।'

পরবর্তী কয়েক ঘন্টায় সংগৃহীত উপাত্ত থেকে জানা গেল যে রকমটি আশা করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি জোরালো হয়েছে বিস্ফোরণ। গ্রোভস সমরমন্ত্রী স্টিমসনকে জানালেন যে ১৫০০০ থেকে ২০০০০ টন টি.এন.টি-র সমতুল্য বিস্ফোরণ ঘটেছে। যে ইস্পাতের টাওয়ারটির সাথে বোমাটি বেঁধে দেওয়া হয়েছিল সেটি প্রচণ্ড উত্তাপে বাষ্পীভূত হয়ে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের দু'শ কোটি ডলার বিনিয়োগের সার্থক পরিণতি। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন যে তাঁদের জ্ঞান সঠিক এবং রাজনীতি-বিদরা প্রমাণ দিলেন যে বিজ্ঞানীদের উপর ভরসা স্থাপন করে তাঁরা প্রতারিত হন নি। মানহাট্টান প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এই বিজ্ঞ মানব জাতির আত্মপ্রতারণার শক্তি সত্যিই অপরিমেয়।

পঞ্চম অধ্যায়

গর্ভনাটিকা—বিজ্ঞানী বনাম রাজনীতিবিদ

নীল্‌স বোর আইনস্টাইনের মত জগতজোড়া খ্যাতি লাভ করেন নি। তাঁর খ্যাতি সীমাবদ্ধ ছিল ইউরোপে এবং বিশেষভাবে বিজ্ঞানী মহলে। কিন্তু তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানে তিনি যে একজন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক সেটা প্রায় তর্কাতীত। হান ও স্ট্রসম্যান কর্তৃক ইউ-রেনিয়াম নিউক্লিয়াস বিভাজনের পর বোর এই বিভাজনের যে তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন প্রধানত তারই ভিত্তিতে পারমাণবিক বোমা তৈরি সম্ভব হয়েছিল। এটা জানা ছিল যে ইউরেনিয়ামের তিনটি বিভিন্ন আইসোটোপ (ইউরেনিয়াম-২৩৮, ২৩৫, ২৩৪) এমন মিশ্রিত অবস্থায় বিদ্যমান যে তাদেরকে আলাদা করা প্রায় দুঃসাধ্য। এই মিশ্রণে শতকরা ৯৯ ভাগ হল ইউরেনিয়াম-২৩৮। এক হাজার ইউরেনিয়াম নিউক্লির মধ্যে সাতটি হ'ল ইউরেনিয়াম—২৩৫ নিউক্লি। বোরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই দুষ্প্রাপ্য ইউরেনিয়াম—২৩৫ আইসো-টোপই বিদারণীয়। একটা নিউট্রন ইউরেনিয়াম—২৩৫ আইসো-টোপের মত বিজোড় ভর সংখ্যা যুক্ত নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করলে সেটা জোড় ভর সংখ্যায় পরিণত হবে এবং ভেঙে দু'খণ্ড হবে। অবরুদ্ধ নিউট্রন যদি জোড় ভর সংখ্যাকে বিজোড় ভর সংখ্যায় পরিণত করে তাহলে ঐ নিউট্রনটি নিউক্লিয়াসের মধ্যেই রক্ষিত হবে এবং নিউক্লিয়াস সহজে ভাঙবে না। বোরের এই তাত্ত্বিক ভবি-ষৎবাণী অচিরেই পরীক্ষার দ্বারা সমর্থিত হল। এটা সুস্পষ্টভাবে

banglainternet.com

বোঝা গেল যে দুষ্প্রাপ্য ইউরেনিয়াম—২৩৫ আইসোটোপই প্রধানত নিউট্রনের সাহায্যে বিদারণীয়।

পরমাণু ভাঙনের ওপর বোরের এই তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে। তখনও বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় নি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯৪০ সাল থেকেই তিনি ব্রিটেন ও আমেরিকায় অনুষ্ঠিত পারমাণবিক অস্ত্র সংক্রান্ত সব রকম উদ্যোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকে নাৎসী অধিকৃত স্বদেশে ডেনীয় প্রতিরোধীদের মাধ্যমে তিনি একটি পত্র পেলেন। এই পত্রটি ছিল ইংল্যাণ্ডের ছাদউইক কর্তৃক লিখিত একটি আমন্ত্রণ পত্র। ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছাদউইক এই পত্রটি লিখেছিলেন। তিনি বোরকে ইংল্যাণ্ডে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ছাদউইক লিখেছিলেন যে পৃথিবীতে আপনার মত কোন দ্বিতীয় বিজ্ঞানী নেই যিনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ মানুষের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য হবেন। কয়েকটি বিষয়ে বোরের জ্ঞান যে তাঁদের কাজে লাগতে পারে এমন ইঙ্গিতও ঐ চিঠিতে ছিল, যদিও বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি। বোর জানালেন যে তিনি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে অপারগ। কারণ হিটলারের কবল থেকে বেরিয়ে এসে যে সব বিদেশী বিজ্ঞানী তাঁর এখানে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের রক্ষার জন্য তাঁর দেশে থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু চিঠিতে উল্লেখিত বিষয়গুলির স্বরূপ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি ছাদউইককে জানিয়েছিলেন, 'সর্বোপরি, আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী আমি নিশ্চিত যে পারমাণবিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলির ভবিষৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলেও তার আশু কোন ব্যবহার দুঃসাধ্য।'

১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হল যে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। ডেনীয় প্রতিরোধীরা সে রাতেই তাঁকে সুইডেনে পার করে দিল। ব্যাপারটা ব্রিটেনকে জানিয়ে রাখা হয়েছিল। স্টকহল্মে কয়েকদিন কাটানোর পর চারওয়েল (Charwell) তাঁকে ইংল্যাণ্ডে আমন্ত্রণ জানালেন। কয়েকদিন পরেই তাঁকে বিমানে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে আসা হল। ইংল্যাণ্ডে তাঁকে সুরক্ষিত এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অবস্থায় রাখা হল। চারওয়েল ও এণ্ডারসন তাঁকে জানালেন বিগত দু'বছরে পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনের বিস্ময়কর অগ্রগতির বৃত্তান্ত।

বর্তমান যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রভাবের ওপরই অধিকাংশ বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ ও সামরিক ব্যক্তিদের চিন্তা-ভাবনা কেন্দ্রীভূত ছিল। বোরের প্রতিক্রিয়া হল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। পারমাণবিক অস্ত্রের দীর্ঘ মেয়াদী ফলাফল বোর সবার আগে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। মিত্র শক্তি যদি পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে সাফল্যের দোর গোড়ায় উপনীত হয়ে থাকে (বোরকে যা জানানো হয়েছিল) তাহলে এই সাফল্য বর্তমান যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাবে। এ ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে আলোচনা করার কিছু নেই। কিন্তু বোরের প্রশ্ন, পরে কি ঘটবে? রাশিয়ানরাও ঐ একই অস্ত্র তৈরির জন্য তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করবে। বোরের অভিমত হল রাশিয়ানদের এখনই এই অস্ত্র তৈরির উদ্যোগের কথা জানানো উচিত, অবশ্য খুঁটিনাটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ না করে। অন্যথায় যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে পারস্পরিক সন্দেহ থেকে অবধারিতভাবে শুরু হবে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা।

লণ্ডনে পৌছানোর কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁকে আমেরিকায় আমন্ত্রণ জানানো হল। মানহাট্টান প্রকল্পের কর্ণধার জেনারেল

banglainternet.com

গ্রোডস উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর পরামর্শ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে। বাহ্যত পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির পরিকল্পনায় সাহায্যের উদ্দেশ্যেই তাঁর এই যাত্রা। কিন্তু বোরের অভিপ্রেত ছিল ভিন্ন। পরে তিনি এ ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন: 'পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্য আমার সাহায্যের প্রয়োজন তাদের ছিল না।' বোরের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল যে তাদের আসল প্রয়োজন সেই পরামর্শের যা যুদ্ধোত্তর অবস্থাকে সামাল দিতে সাহায্য করবে।

ফেলিক্স ফ্রাঙ্কফুর্টার নামে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের একজন নামজাদা বিচারক ছিলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বন্ধু এবং বেসরকারী উপদেষ্টা। পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়ঙ্কর সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন কয়েকজন আমেরিকান বিজ্ঞানী ইতিমধ্যেই তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। বোরের সাথে তাঁর পূর্ব পরিচয় ছিল। আমেরিকায় পদার্পণ করেই বোর তাঁর সাথে যোগাযোগ করেন। সুপ্রীম কোর্ট ভবনে তাঁরা মিলিত হন এবং পারমাণবিক বোমা নিয়ে আলোচনা করেন। বিবেকের তাড়নায় বিক্ষত বোরের সাথে আলাপ করে ফ্রাঙ্কফুর্টার বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং বোরের বক্তব্যগুলি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিকট উত্থাপন করেছিলেন। এক দীর্ঘ সাক্ষাতের সময় রুজভেল্ট ফ্রাঙ্কফুর্টারকে জানান যে পারমাণবিক বোমার সমস্যাটা তাঁর জন্য মারাত্মক উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। তারপর তিনি ফ্রাঙ্কফুর্টারকে বললেন বোরকে এই সংবাদটুকু জানাতে যে তিনি চার্চিলের সাথে বিষয়টা খতিয়ে দেখতে সানন্দে রাজি হবেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ব্রিটিশ দূত লর্ড হ্যালিফাক্স বিষয়টার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বোরকে তৎক্ষণাৎ লণ্ডন যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। প্রেসিডেন্টের যে বার্তা তাঁকে দেয়া হল তাতে বলা হল যে বিষয়টা নিয়ে

কিভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে চার্চিলের ধ্যান ধারণাকে রুজভেল্ট স্বাগত জানাবেন। বেশ আস্থার সাথে ১৯৪৪ সালের এপ্রিলে তিনি লণ্ডনে ফিরে এলেন। স্ব-অর্পিত কর্তব্য কর্মের অংশবিশেষ তিনি সম্পন্ন করেছেন এবং তাঁর বিশ্বাস হল যে চার্চিলের কাছেও তিনি তাঁর ধ্যানধারণাকে তুলে ধরতে পারবেন।

এই ক্ষণটিতে বোরের সৌভাগ্যসূর্য অস্তহিত হল এবং অতি নাটুকেপনা না করে বলা চলে যে সেই সাথে লুপ্ত হল মানব জাতির ভবিষ্যৎ আশা ভরসার সম্ভাবনা। লণ্ডনে প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথেই বোরকে জানানো হল যে রাশিয়ান দূতাবাসে তাঁর নামে একটা চিঠি এসেছে। যতই সাবধানতা অবলম্বন করা হোক না কেন, ঐ দূতাবাসের সদস্যরা লণ্ডনে বোরের উপস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত ছিল। দূতাবাসের কাউন্সিলর বোরের নিকট চিঠি হস্তান্তর করেন।

চিঠিটি এসেছিল বোরের পুরান বন্ধু পিটার কাপিতজার কাছ থেকে। কাপিতজা লিখেছিলেন যে তাঁরা বোরের নিষ্ক্রমণের খবর জেনেছেন। বোরের নিরাপত্তার ব্যাপারে তাঁরা উদ্বিগ্ন। তাঁরা খুশী হবেন বোর ও তাঁর পরিবার যদি রাশিয়ায় বসবাস করতে অভিলাষী হন এবং তিনি নিজে এবং তাঁর সব সহকর্মীরা সম্মানিত বোধ করবেন।

চিঠিটি বোর এণ্ডারসনকে এবং ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থাকে দেখিয়েছিলেন এবং তাদের পরামর্শ অনুসারে এবং তাদের অনুমোদন নিয়ে জবাবটি তৈরি করেছিলেন। এই জবাবের মাধ্যমে বিনয়ের সাথে রাশিয়াকে জানানো হয়েছিল যে আপাতত তাঁর রাশিয়ায় বসবাসের কোন পরিকল্পনা নেই।

তারপর তিনি চার্চিলের সাথে সাক্ষাতের প্রচেষ্টা পুনরায় চালাতে শুরু করলেন। স্যার হেনরি ডেল ছিলেন রয়্যাল সোসাইটির সদস্য। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা কমিটিরও

banglainternet.com

তিনি সদস্য ছিলেন। এণ্ডারসন, চারওয়েল এবং ডেলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চার্চিল শেষ পর্যন্ত বোরের সাথে সাক্ষাতকারে রাজি হলেন। এই উদ্দেশ্যে ডেল যে চিঠিটি চার্চিলকে লিখেছিলেন সেটি বিশেষ প্রনিধানযোগ্য :

"আমি এই দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে বিজ্ঞান বর্তমানে এমন একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে চলেছে যেটা মানুষের ভবিষ্যতের জন্য বয়ে আনতে পারে এমন অপরিমেয় কল্যাণ কিংবা ধ্বংস যা পূর্বে অকল্পণীয় ছিল। যে প্রলয়ংকারী অস্ত্রের উৎপাদন এখন অচিরেই সম্পূর্ণ হবে বলে মনে হচ্ছে সেটাই ঐ অস্ত্রের মালিকদের সারা দুনিয়ার উপর এক তরফা কর্তৃত্বের শক্তি যোগাবে। প্রধানত বোরের তত্ত্বীয় কাজের ভিত্তেতে এবং ইদানিং তাঁর সক্রিয় সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের প্রধান বিজ্ঞানীদের দ্বারা এই অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। কিন্তু এই অস্ত্রের যে অপরিসীম রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে তার মোকাবেলা করা এই বিজ্ঞানীদের সাধ্যাতীত। তথাপি, বর্তমানে যা ঘটছে এবং যা কিছু এই অস্ত্রের সাথে সম্পর্কিত তার প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বিজ্ঞানীদের পক্ষে নীরব থাকা অসম্ভব। যে দুজন মাত্র ব্যক্তির হাতে এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা আছে তাঁরা হলেন স্বয়ং আপনি এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। এই অস্ত্রের প্রকৃত গুরুত্ব যাতে আপনাদের দ্বারা সময়মত বিবেচিত হয় এমন কোন সুযোগকে বিজ্ঞানীরা হেলা করতে পারেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনাদের হাতে যে ক্ষমতা আছে এবং এমন কি আগামী ছ-মাস পর্যন্ত থাকবে তার সাহায্যে যে সিদ্ধান্ত আপনারা নেবেন সেটাই মানব ইতিহাসের ভবিষ্যত ধারা নির্ধারণ করবে। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই স্বল্প সময়ের জন্য প্রফেসর বোরকে আপনার সান্নিধ্যের সুযোগ দিতে অনুরোধ

জানাতে আমি সাহস করেছি।"

চার্চিল শেষ পর্যন্ত বোরকে সাক্ষাতকার দিতে রাজি হলেন। বোর তিন দিন ব্যয় করলেন তাঁর বক্তব্যের খসড়া তৈরী ও আলোচনায়। ১৬ই মে চারওয়েল তাঁকে চার্চিলের কাছে নিয়ে গেলেন।

এই সাক্ষাতকারটি বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সাঙ্গ হল। বোর পরে বলেছিলেন, 'এটা ছিল ভয়াবহ! তিনি এমনভাবে বকাঝকা করেছিলেন যেন আমরা দুটি স্কুলের ছাত্র।'

বোরের বক্তব্য শোনার পর চার্চিল যে জবাব দিয়েছিলেন তা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে পারমাণবিক বোমার প্রকৃত তাৎপর্য তিনি আদৌ ধারণায় আনতে পারেন নি।

"আমি ঠিক ধরতে পারলাম না আপনি কি বললেন। যাহোক, বর্তমানে আমাদের যেসব বোমা আছে তারচেয়ে এই নূতন বোমাটি বেশী জোরালো হবে। এটা রণনীতিতে কোন পরিবর্তন ঘটাবে না। এবং যুদ্ধোত্তর সমস্যাগুলোর মধ্যে এমন কিছু নেই যেটা আমি এবং আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট নিজেদের মধ্যে বন্ধুসুলভভাবে নিষ্পত্তি করতে পারব না।"

এই লাঞ্ছনা সত্ত্বেও বোর হাল ছাড়তে অস্বীকার করলেন। জুনের প্রথমেই তিনি আমেরিকায় ফিরে এলেন। তিনি এবং তাঁর ছেলে রুজভেল্টের উদ্দেশ্যে ৭ পাতার এক স্মারকলিপি তৈরী করলেন। এই স্মারকলিপিতে তিনি পুনরায় ব্যক্ত করলেন যে পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করার আগে যে কোন ভাবে হোক রাশিয়ানদের জানানো প্রয়োজন। স্মারকলিপি ফ্রাঙ্কফুর্টারের কাছে হস্তান্তর করা হল। ফ্রাঙ্কফুর্টার মৌখিকভাবে রুজভেল্টকে এর সারাংশ জানালেন, তাঁর সাথে দু'দফা আলাপ আলোচনা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত বোরকে সাক্ষাতকার দিতে প্রেসিডেন্টকে রাজি করালেন।

banglainternet.com

ফ্রাঙ্কফুর্টারের মারফত বোরের স্মারকলিপিটি পাওয়ার পর ২৬শে আগষ্ট রুজভেল্ট বোরের সাথে মিলিত হলেন। এই সভা চলেছিল এক ঘন্টা ব্যাপী। স্মারকলিপির মূল বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছিল:

"অব্যাহত গোপনীয়তা আমেরিকান--রাশিয়ান সম্পর্ককে বিষাক্ত করবে এবং শান্তির সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করবে। মৌখিকভাবে রাশিয়াকে যুদ্ধের অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করে আমেরিকা যদি তার গোটা পারমাণবিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে রাশিয়ার কাছ থেকে গোপন রাখে এবং অপরদিকে ব্রিটেনের সাথে একযোগে কাজ করে তাহলে রাশিয়ার পক্ষে চিন্তা করার যুক্তি থাকবে যে সে এক অপরিমেয় এবং দৃষ্টান্তহীন বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছে। সম্ভবত ব্যক্ততার নীতি কোন উন্মুক্ত পৃথিবীর জন্ম দেবে না। কিন্তু রাশিয়ার সাথে অকপটভাবে কাজকারবার করার ব্যর্থতা নিশ্চিতভাবে একটা রুদ্ধ পৃথিবীর জন্ম দেবে--ভাগাভাগি ও হানাহানির পৃথিবী, এমন একটা অস্ত্রসজ্জিত পৃথিবী যা ইতিহাসে এই প্রথম বার নিজেকে বিষাক্ত ভস্মাবশেষে পরিণত করার সামর্থ অর্জন করেছে।"

রুজভেল্ট প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয়েছিল। তিনি নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে সামনের মাসে তিনি চার্চিলের সাথে মিলিত হবেন। রাশিয়ার সাথে যে কোন ধরণের যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি বিশেষ জোর দেবেন। বোরের মনে হয়েছিল একেবারে শেষ মুহূর্তে পৌঁছে একটা দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে। কিন্তু তাঁর এই ধারণা সত্য প্রামাণিত হয় নি, বাস্তবে যা ঘটল তা তাঁর ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত।

১৯শে সেপ্টেম্বর রুজভেল্ট পারমাণবিক বোমার বিষয়ে চার্চিলের সাথে আলোচনা করেছিলেন। আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় নি। কিন্তু তাঁদের উভয়ের স্বাক্ষরিত পত্রে আলোচনার ফলাফল

এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

১) একটি আন্তর্জাতিক চুক্তির অধিনে 'টিউব এলয়েসের' (Tube Alloys—বৃটিশ পারমাণবিক বোমা প্রকল্পের ছদ্মনাম) নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারের উদ্দেশ্য এ সংক্রান্ত বিষয় খোলাখুলি ব্যক্ত করা উচিত বলে যে অভিভাবন (Suggestion) উত্থাপিত হয়েছিল তা গৃহীত হল না। বিষয়টি সব চেয়ে গোপনীয় হিসাবে গণ্য হবে। তবে, শেষ পর্যন্ত একটা বোমা তৈরী যখন সম্পূর্ণ হবে তখন সম্ভবত ধীরস্থিরভাবে বিবেচনা করে জাপানীদের বিরুদ্ধে এটা ব্যবহার করা যেতে পারে।

২) যৌথভাবে অবসান না করা পর্যন্ত জাপানের পরাজয়ের পর সামরিক ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে 'টিউব এলয়েস' প্রকল্পের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের পূর্ণ সহযোগিতা চালু থাকবে।

৩) প্রফেসর বোরের কাজকর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো হোক এবং পারমাণবিক বোমা সংক্রান্ত কোন বৃত্তান্ত যাতে তাঁর মাধ্যমে বাইরে বিশেষভাবে রাশিয়ানদের কাছে না পৌঁছাতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

বোরের নিগ্রহের এখানেই অবসান ঘটল না। উপরের পত্রটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরের দিনই চার্চিল একটা নোট পাঠান চার-ওয়েলকে। এই নোটে চার্চিল উল্লেখ করেছেন :

প্রেসিডেন্ট এবং আমি প্রফেসর বোর সম্বন্ধে খুবই উদ্বিগ্ন। তিনি প্রচারের একজন বড় অধিবক্তা (Advocate)। কোন অনুমোদন ছাড়াই প্রধান বিচারপতি ফ্রাঙ্কফুর্টারের কাছে তিনি এসব বিষয় প্রকাশ করেছেন। ফ্রাঙ্কফুর্টার প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছেন যে এ ব্যাপারে বিস্তারিত সব কিছুই তাঁর জানা। প্রেসিডেন্ট এতে আতঙ্কিত হয়েছেন। ফ্রাঙ্কফুর্টার তাঁকে আরও জানিয়েছেন

banglainternet.com

যে বোরের সাথে একজন রাশিয়ান প্রফেসরের ঘনিষ্ঠ পত্র যোগাযোগ আছে। রাশিয়ায় এই পুরান বন্ধুটিকে এসব ব্যাপার তিনি জানিয়েছেন এবং এখনও জানিয়ে চলেছেন। বিষয়টা আলোচনার উদ্দেশ্যে রাশিয়ান প্রফেসর তাঁকে রাশিয়ায় যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এ সব কি ব্যাপার? আমার মনে হয় বোরকে অন্তরীণ রাখা উচিত অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে এটা বোঝাতে হবে যে তিনি মারাত্মক দুষ্কর্মের একেবারে সন্নিকটে এসে পড়েছেন। আমি আগে এসব কিছুই ধারণা করতে পারি নি, যদিও যখন আপনি তাঁকে আমার কাছে এনেছিলেন তখন মাথাভরা উস্কখুস্ক চুলওয়ালা মানুষটিকে আমি পছন্দ করি নি। এই মানুষটি সম্বন্ধে আপনার মতামত ফেরত ডাকে আমাকে জানানো হোক। ব্যাপারটা আমি আদৌ পছন্দ করি নি।

রুজভেল্ট-ফ্রাঙ্কফুর্টার চিঠিপত্রের ব্যাখ্যাতা ম্যাক্স ফ্রিডম্যানের মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই ব্যাপারটাতে আমেরিকানরাও সমান উৎসাহে যোগ দিয়েছিল :

"বোরের সাথে সংযোগ নিষিদ্ধ হল। তাঁর সম্বন্ধে গোপন অনুসন্ধান চালানো হল। কিছুদিনের জন্য তার গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখা হল। চার্চিলের প্রভাবে বোরের উপর রুজভেল্টের আস্থা রূপান্তরিত হল সন্দেহে। এমন কি প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্টিমসনের সাথেও বোরের সাক্ষাতকার নিষিদ্ধ হল।"

আঁতে ঘা লাগার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকলে তথাকথিত মুক্ত বিশ্বের কর্ণধাররা কতখানি নির্মম হতে পারেন নীলস্ বোরের এই নিগ্রহ থেকে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বোর প্রস্তাব করেন নি যে পারমাণবিক বোমার রহস্য রাশিয়ার কাছে উদঘাটন করা হোক। তিনি অনুরোধ করেছিলেন রাশিয়ানদের শুধুমাত্র এইটুকু

জানাতে যে আমেরিকানরা পারমাণবিক বোমা তৈরীতে রত। রাশিয়াকে এই সংবাদটুকু জানালে যুদ্ধোত্তর সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনায় তারতম্য ঘটত কিনা সে প্রশ্ন না তুলেও এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এই গোপনীয়তা রাশিয়ার পারমাণবিক বোমা অর্জনে সামান্যতম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে নি। কারণ আমেরিকানদের এই উদ্যোগের সংবাদ রাশিয়ার অবিদিত ছিল না। পক্ষান্তরে এই গোপনীয়তা ব্রিটেনের পক্ষে যে মারাত্মক পরিণতি বয়ে এনেছে তার প্রমাণ বর্তমানে আমেরিকার পারমাণবিক ছত্রচ্ছায়াই তার আত্মরক্ষার একমাত্র ভরসা।

banglainternet.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংহার পর্ব—হিরোসিমা ও নাগাসাকি

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট, রাত ২-৪৫ মিনিট। যুক্তরাষ্ট্র বিমান বাহিনীর কর্ণেল পল টিব্বেটস টিনিয়ান ((Tinian) বিমান বন্দর থেকে তাঁর উড্ডয়ন শুরু করলেন। তিনটি আবহাওয়া বিমান পূর্বেই যাত্রা শুরু করেছিল। পারমাণবিক বোমা কোথায় ফেলা হবে সেই লক্ষ্যস্থলগুলির প্রাথমিক পরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল এই বিমান তিনটি। কর্ণেল টিব্বেটস-এর বিমানকে অনুসরণ করে উড়ে চললো আরো দুটি পর্যবেক্ষণ বিমান।

৮-১৫ মিনিটে টিব্বেটসকে জানানো হল যে হিরোসিমা তুলনা-মূলকভাবে মেঘমুক্ত। এক ঘণ্টা পরেই টিব্বেটস তাঁর লক্ষ্যবস্তুর উপর পৌঁছে গেলেন। একত্রিশ হাজার ছ'শ ফুট উপর থেকে যে বস্তুটি তিনি হিরোশিমার উপর বর্ষণ করলেন তার নামটি ছিল 'শীর্ণ মানব' (Thin Man)। বন্দুকের মত লম্বা ধাঁচের ইউরেনিয়াম বোমাটিকে তার গঠন চরিত্রের খাতিরে এই মানানসই নামটি দেওয়া হয়েছিল। হিরোশিমা শহরের এক হাজার ফুট উপরে এটি বিস্ফোরিত হল। এই বিস্ফোরণে নিহত হল এক লাখ তের হাজার দু'শ একাত্তর জন মানুষ, আহতের সংখ্যা একান্ন হাজার, ধ্বংস হল সত্তর হাজারের বেশি ঘরবাড়ি, গৃহহীন হল এক লাখ সত্তর হাজারেরও বেশি লোক।

৯ই আগষ্ট নাগাসাকি বন্দরের উপর বর্ষিত হল দ্বিতীয় পারমাণবিক বোমাটি। এটি ছিল প্লুটোনিয়াম বোমা। এখানে নিহতের সংখ্যা চৌষট্টি হাজার এক শ' ছিয়াশি, আহত পঁচিশ হাজার। শহরটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হল।

আণবিক যুগ থেকে পারমাণবিক যুগে মানব সভ্যতার উত্তরণ ঘটল এই নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে।

এই গণহত্যা কি অপরিহার্য ছিল? এই ধ্বংসযজ্ঞের মূল পুরোহিত ট্রুম্যান সাহেব, তাঁর উত্তরসূরীরা এবং বিশেষভাবে তাঁদের বর্তমান প্রতিনিধি এই গণহত্যার সমর্থনে বক্তব্য রেখেছেন যে বর্বর জাপানীদেরকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ত্বরিত অবসান ঘটানোর জন্য এই গণহত্যা ছিল অপরিহার্য। প্রথম পারমাণবিক বোমা বর্ষণের চল্লিশ বছর পর প্রেসিডেন্ট রেগান সাহেব মন্তব্য করেছেন:

ওয়াশিংটন, ৬ই, আগস্ট (এ, এফ, পি)—

'প্রেসিডেন্ট রেগান গতকাল এখানে বলেছেন যে মানব ইতিহাসে সব চেয়ে বড় যুদ্ধের অবসান ঘটানো এবং মিত্রশক্তির দশ লাখেরও বেশি প্রাণহানি এড়ানোর জন্য হিরোসিমায় আমরা বোমা ফেলেছিলাম। জাপানকে আক্রমণ করলে এত বেশি লোকের প্রাণহানি ঘটত।

রেগান বলেন, শত্রুদের প্রতিরোধ এবং দ্বীপটিতে প্রচারাভিযান এমন ছিল যে, জানতাম আমরা জীবন বাজি রাখা প্রতিরোধের সম্মুখীন হব।'

রেগান সাহেব অবশ্য তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কোন তথ্য উপস্থাপিত করেন নি। দায়িত্বটা তাই আমাদের ওপর বর্তেছে। সত্যিই কি পরিস্থিতি এমন ছিল যে যুদ্ধের ত্বরিত অবসানের জন্য পারমাণবিক বোমা বর্ষণ ছাড়া কোন বিকল্প পন্থা ছিল না?

banglainternet.com

প্রচলিত অস্ত্রের সাহায্যে জাপান আক্রমণ করলে সত্যিই কি মিত্র-শক্তির দশ লাখ প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল ?

রেগান সাহেবের বক্তব্যের যাথার্থ নির্ণয়ের জন্য আমরা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দলিল দস্তাবেজ থেকে কিছু তথ্য পেশ করব। এই তথ্যগুলি থেকেই ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের আগস্টে জাপানের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে।

জাপান সরকার তার বৈদেশিক দূতাবাসগুলিতে বার্তা পাঠানোর জন্য যে সাঙ্কেতিক লিপি ব্যবহার করত ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালের মধ্যেই আমেরিকানরা তার রহস্য সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত করতে সমর্থ হয়েছিল। এই সাঙ্কেতিক লিপির নাম ছিল রক্তবর্ণ সঙ্কেত-লিপি (purple code)। এই উন্মোচনের ফলে জাপানের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের পাঠানো সকল বার্তাই তাদের সুস্পষ্ট অর্থসহ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের চাঁইদের টেবিলে জমা হচ্ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের নৌ বাহিনী মন্ত্রী জেমস ফরেসটাল ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই এক বাণ্ডিল সাঙ্কেতিক লিপির উদ্ধারকৃত সারমর্ম পেলেন। জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মস্কোতে জাপানী দূতের কাছে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তাদের উদ্ধারকৃত অনুলিপি ছিল ঐ বাণ্ডিলটি। এই অনুলিপিগুলি পাঠ করে ফরেসটাল মন্তব্য করেছিলেন যে 'এই বার্তাসমূহ থেকে এটা পরিষ্কার যে জাপান সামগ্রিক ও চূড়ান্তভাবে পরাজিত এবং এটা উপলব্ধি করে দ্রুত ও নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণই তাদেরই সামনে একমাত্র পথ।'

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই ঐতিহাসিক পটাসডাম সম্মেলন শুরু হয়। এই সম্মেলন শুরু হওয়ার আগেই জাপান বুঝতে পেরেছিলো যে তার অবস্থা ক্রমবর্ধমানরূপে হতাশাপূর্ণ হতে চলেছে। জাপান সরকারের নির্দেশে জাপানী দূত বারবার রাশিয়ার

কাছে ধর্ণা দিচ্ছিল যাতে রাশিয়া মধ্যস্থ হয়ে এই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে সাহায্য করে। পটাসডাম সম্মেলন স্ট্যালিন ট্রুম্যানকে জানিয়েছিলেন যে জাপান যুদ্ধের অবসানের জন্য বারবার রাশিয়ার কাছে ধর্ণা দিচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সাঙ্কেতিক লিপি উদ্ধারকারী দলের নেতা উইলিয়াম ফ্রিডম্যান প্রকাশ্য বক্তব্য রেখেছেন যে 'যদি প্রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগের কোন উপায় আমার থাকত তাহলে আমি সুপারিশ করতাম যে বোমা বর্ষণের সিদ্ধান্ত তিনি যেন না নেন—কারণ যুদ্ধ এক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হবে।'

কাজে কাজেই এটা পরিষ্কার যে, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসেই যুক্তরাষ্ট্র সরকার সন্দেহাতীতভাবে জানতে পেরেছিল যে জাপান আত্মসমর্পণের জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে। আমেরিকার নিজস্ব সূত্র এবং বহিসূত্র থেকে পাওয়া সব বার্তায় জাপানের শোচনীয় অবস্থার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মিত্র শক্তির প্রচলিত বোমার আঘাতেই জাপান তখন পর্যুদস্ত। সুতরাং রেগান সাহেবের কথিত 'শত্রুর জীবন বাজি রাখা প্রতিরোধ' এবং 'মিত্রশক্তির দশ লাখেরও বেশি প্রাণহানি' ইত্যাদি নিতান্তই ছেঁদো কথা। অন্তত আমেরিকার সরকারী নথিপত্র থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে সে তথ্যের সাথে তাঁর উক্তির বৈপরীত্য অতিশয় প্রকট।

সরকারীভাবে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেছিল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ত্বরিত অবসানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র জাপানে পারমাণবিক বোমা বর্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের এই ঘোষিত লক্ষ্যের সাথে তার কর্মপন্থার স্ববিরোধীতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে বোমার লক্ষ্যস্থলগুলি বিশ্লেষণ করলে।

জাপানের কোন্ অঞ্চলে পারমাণবিক বোমা বর্ষণ করা হবে সেটা

banglainternet.com

স্থির করার জন্য ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটি যে লক্ষ্যস্থলগুলি প্রস্তাব করেছিল তা থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার হিরোসিমা ও নাগাসাকিকেই বেছে নিয়েছিল।

জাপানের সম্রাট ও জাপান সরকারের অধিষ্ঠান টোকিয়োতে। টোকিয়ো থেকে হিরোসিমার দূরত্ব পাঁচশ মাইল। পারমাণবিক বোমার আঘাতে জাপানী সরকারের মনোবল ভেঙে দিয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য করানোই যদি পারমাণবিক বোমা বর্ষণের কারণ হয়, অন্তত প্রধান কারণ, তাহলে রাজধানী থেকে পাঁচ শ' মাইল দূরে হিরোসিমার মত একটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বেসামরিক লোকজনের ওপর বোমা বর্ষণের কি যুক্তি থাকতে পারে? এটা তো জানাই ছিল যে বোমাটি বিস্ফোরিত হওয়ার সাথে সাথেই টোকিয়োর সাথে হিরোসিমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাহলে এই বোমার ভয়াবহতা টোকিয়োর সরকার কি ভাবে উপলব্ধি করবে?

বাস্তবে দেখা গেল যে ৬ই আগষ্ট বোমাটি বর্ষিত হওয়ার পর হিরোসিমা পরিস্থিতির সংবাদ খুবই বিলম্বে টোকিয়োতে পৌঁছাতে থাকে এবং ৮ই আগষ্ট পর্যন্ত এই ধ্বংসযজ্ঞের অতি সামান্য অংশই টোকিয়োর পক্ষে জানা সম্ভব হয়েছিল। ৯ই আগষ্ট দ্বিতীয় বোমাটি বর্ষিত হয় নাগাসাকিতে। ১০ই আগষ্ট জাপান আত্মসমর্পণে রাজি হয়।

ঘটনাগুলির পরম্পরা পর্যালোচনা করলে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে টোকিয়োস্থ জাপান সরকারের পক্ষে আগষ্টের ৯-১০ তারিখের মধ্যে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে বর্ষিত বোমা দুটির ধ্বংসশক্তি ও প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। পারমাণবিক বোমার প্রকৃত ভয়াবহতা তখনও তাদের কাছে অজ্ঞাত। কাজে কাজেই পারমাণবিক বোমার আঘাত হেনে জাপানকে আত্মসমর্পণে

বাধ্য করা হয়েছে বলে যুক্তরাষ্ট্র যে ধারণা বিশ্ববাসীকে বুঝিয়েছে সেটা নেহাতই ধোকাবাজি।

আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত বোমাবর্ষণ জরিপের (U S strategic Bombing survey) প্রতিবেদন থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি :

"জাপানী বেসামরিক লোকজনের মনোবলের উপর পারমাণবিক বোমা বর্ষণের প্রভাব যে উল্লেখযোগ্যভাবে আঞ্চলিক এটা সুস্পষ্ট। ..... সকল ঘটনার খুঁটিনাটি অনুসন্ধান করে এবং সংশ্লিষ্ট জীবিত জাপানী নেতাদের সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এই জরিপের অভিমত হল যে পারমাণবিক বোমা যদি বর্ষিত না হত, রাশিয়া এই যুদ্ধে না জড়াতো এবং অন্য কোন ধরনের আক্রমণের পরিকল্পনা বা চিন্তা-ভাবনা করা না হত, তাহলেও নিশ্চিতভাবে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্বে এবং খুব সম্ভবত ১লা নভেম্বরের পূর্বেই জাপান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হত।"

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত জেনারেল এবং পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইসেনহাওয়ারের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

"বোমার ব্যবহার সম্বন্ধে আমার গভীর উদ্বেগের প্রথম কারণ এই যে আমার ধারণা হয়েছিল জাপান ইতিমধ্যেই পরাজিত হয়েছে, আর তাই এই বোমা বর্ষণ ছিল নিতান্তই নিষ্প্রোয়জনীয়, দ্বিতীয়ত আমি ভেবেছিলাম যে আমেরিকানদের জীবন রক্ষার্থে যে অস্ত্রের ব্যবহার বাধ্যতামূলক ছিল সেই প্রয়োজন মিটে যাওয়ায় বিশ্ব জনমতের প্রতি এই অভিঘাত থেকে আমাদের দেশের বিরত থাকা উচিত ছিল।"

জেনারেল আইসেনহাওয়ারের এই মন্তব্যই সন্দেহাতীতভাবে

banglainternet.com

প্রমাণ করে যে রেগানের বক্তব্য নির্জলা মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয় কারণ আইসেনহাওয়ারের অবস্থান ছিল ঘটনার কেন্দ্রস্থলে।'

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট একজন ঋজু রাজনীতিবিদ্ - তাঁর মন্ত্রী ও উপদেষ্টারা সবাই অসাধারণ ধীমান ব্যক্তিত্ব। সারা ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মেধা এবং যুক্তরাষ্ট্রের দু'শ' কোটি ডলার সম্পদের বিনিময়ে যে দুটি মাত্র পারমাণবিক বোমা তখনও পর্যন্ত তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল, কি উদ্দেশ্যে সেই মহামূল্যবান বোমা দুটিকে জাপানের উপর ফেলা হয়েছিল? মড়ার উপর খাড়ার ঘা দেওয়ার পশ্চাতে কি নিগূঢ় কোন উদ্দেশ্য ছিল?

পারমাণবিক বোমার সফল পরীক্ষার পর ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ২৪শে জুলাই পটাসডাম সম্মেলনের এক অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কথাচ্ছলে স্ট্যালিনকে জানিয়েছিলেন যে তাঁরা এক বিশেষ ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী অস্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। এই বিশেষ অস্ত্রটি যে পারমাণবিক বোমা আদৌ তা স্ট্যালিনকে বলেন নি এবং স্ট্যালিনও তা জানার ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখান নি। এই কথোপকথনের ঠিক পর দিন ট্রুম্যান তাঁর দিন লিপিতে লিখেছিলেন:

"পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অস্ত্র আমরা আবিষ্কার করেছি। .... আজ থেকে আগামী ১০ই আগষ্টের মধ্যে জাপানের বিরুদ্ধে এটি ব্যবহৃত হবে।

জগতের জন্য এটা নিশ্চিন্তভাবে মঙ্গলজনক যে হিটলার কিংবা স্ট্যালিনের লোকেরা পারমাণবিক বোমা আবিষ্কার করেনি। মানুষের আবিষ্কারের ইতিহাসে এটি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, কিন্তু কার্য সিদ্ধির জন্য এটির চরম উপযোগিতা রয়েছে।"

ঠিক কি কি কার্যসিদ্ধির জন্য পারমাণবিক বোমা একটি উপযোগী হাতিয়ার তা অবশ্য তিনি দিনলিপিতে উল্লেখ করেন নি। তবে

'ইশারাই আক্কেলমন্দের জন্য কাফি' এই প্রবাদ বাক্যের ভিত্তিতে বিদ্বজনেরা এই কার্যসিদ্ধির একটা নির্ঘন্ট তৈরি করেছেন। মার্কিন মহাফেজখানায় রক্ষিত গোপনীয় কাগজপত্র ঘেঁটে জাপানী সাংবাদিকরা কিছু দলিলপত্র আবিষ্কার করেছেন। এ প্রসঙ্গে ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দের ১লা আগস্টের একটি সংবাদ উদ্ধৃত হল:

টোকিও, ১লা আগস্ট (এনা/তাস)।— জাপানে পারমাণবিক বোমা ফেলার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত লক্ষ্যস্থল স্থির করার জন্য বিশেষ কমিটি প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানের নিকট এক সুপারিশ দাখিল করে। ১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মকালে এই চূড়ান্ত সুপারিশ দাখিল করা হয়েছিল। যত বেশি লোক ধ্বংস করা সম্ভব এটাই ছিল সুপারিশের উদ্দেশ্য। সুতরাং সুপারিশে বলা হয় যে, পারমাণবিক বোমা সর্বাপেক্ষা ঘন বসতিপূর্ণ শহরে ফেলতে হবে। 'আকাহাতা' সংবাদপত্রের রিপোর্টে বলা হয় যে সম্প্রতি মার্কিন মহাফেজখানায় গোপনীয় কাগজপত্রের মধ্য থেকে জাপানী সাংবাদিকগণ ঐ দলিলটি আবিষ্কার করেন।

কমিশনের সুপারিশ থেকে দেখা যায় যে, হিরোশিমা ওয়াশিংটনের দৃষ্টি 'আকর্ষণ' করেছিল, কারণ ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে তার লোকসংখ্যা অপেক্ষা শহরে আরো বেশি লোক এসে ভিড় করেছিল। আমেরিকার ব্যাপক বোমা বর্ষণের ফলে অন্যান্য শহর থেকে লোকজন চলে এসে হিরোশিমায় আশ্রয় নিয়েছিল। লাখ লাখ লোককে ঠাণ্ডা মাথায় নিশ্চিহ্ন করার মূলে ছিল 'পরা অস্ত্রের ধ্বংস শক্তি' লোক সমক্ষে জাহির করা। এই নয়া প্রলয়ঙ্করী অস্ত্রের সাহায্যে হোয়াইট হাউজ তার আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছেন কারণ সামরিক দিক থেকে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বর্বর ধ্বংসযজ্ঞ যে অর্থহীন এটা ওয়াশিংটন ভালভাবেই জানতো।

দূরপ্রাচ্যে মার্কিন বাহিনীর সেনাপতি ডগলাস ম্যাক আর্থারের

banglainternet.com

ব্যক্তিগত নোট তার মহাফেজখানায় পাওয়া গিয়েছে এবং এই সব নোটে এটা স্বীকার করা হয়েছে যে যখন দূরপ্রাচ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্তের কারণে সমরবাদী জপানের আত্মসমর্পন পূর্বনির্ধারিত তখনই পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রুমানের নিকট রিপোর্টে জেনারেল জোর দিয়ে বলেছেন যে এমন কি পারমাণবিক বোমা ব্যবহার ছাড়াই দুর্বল জাপানী রাজকীয় বাহিনী মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ চালাতে পারবে না। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নকে "পারমাণবিক ব্লাকমেইলিং"-এর দ্বারা আবিষ্ট বিশ্বে প্রাধান্য অর্জনের লক্ষ্যে হোয়াইট হাউজ ঐ যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে। 'আকাহাতা' পত্রিকায় এই মন্তব্য করা হয়।

জাপানে পারমাণবিক বোমা বর্ষণের পশ্চাতে আমেরিকার উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবত বহুমুখি। কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য যে জগতে নিরঙ্কুশ আধিপত্য লাভের অভিলাষ তা প্রায় সন্দেহাতীত। আর এই বিষধর অভিলাষ জন্ম দিয়েছে যে বিষবৃক্ষের তার আটপৌরে নামটি হল পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা।

সপ্তম অধ্যায়

পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার অশনি সংকেত

রাশিয়ার ভৌগলিক অবস্থানটাই বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। ভূখণ্ড হিসাবে রাশিয়া আমেরিকার আড়াইগুণ। তার বিরাট বিস্তৃত সীমান্ত বরাবর আছে নানা ধরনের বৈরি শক্তি। পশ্চিমে ন্যাটোভুক্ত ইউরোপীয় দেশগুলি। এদের মধ্যে বিশেষভাবে জার্মানী দু' দু'বার রাশিয়ায় আগ্রাসন চালিয়েছে। সদ্য সমাপ্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী তো দেশটাকে প্রায় দখল করে ফেলেছিল আর কি! দু'কোটি প্রাণহানি আর অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে রাশিয়া শেষ পর্যন্ত নিজেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিল। নেপোলিয়ানের রাশিয়া অভিযান বিস্মৃত হলেও প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ায় মার্কিনী হস্তক্ষেপ এতই তাজা ঘটনা যে কোন রুশীর পক্ষে তা ভোলা অসম্ভব। রাশিয়ার পূর্বে অবস্থিত বিরাট বিশাল চীন। দক্ষিণে আফগানিস্থান ও ইরান-দুটিই অস্থিতিশীল দেশ।

পারমাণবিক বোমার উপর আমেরিকার একক কর্তৃত্ব তাই রুশিদের সন্ত্রস্ত করে তুললো। হিরোশিমা ও নাগাসাকির পরিপূর্ণ বিবরণ যখন তাদের কাছে পৌছাল তখনই তারা উপলব্ধি করল যে তার তিনশত ডিভিশান সেনাবাহিনী এখন নখদন্তহীন শার্দুলে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি পর্বে শক্তির ভারসাম্যের সম্ভাবনায় সে যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছিল ঠিক সেই মুহূর্তে মার্কিন পারমাণবিক বোমা তার সকল হিসাবনিকাশকে ভণ্ডুল করে প্রতিরক্ষার

banglainternet.com

ভঙ্গুরতাকে করে তুলল প্রকট। আমেরিকা ও তার দোহার ব্রিটেন এই দুই মিত্র শক্তি যেভাবে তৃতীয় মিত্র শক্তি রাশিয়াকে এই বিশেষ অস্ত্রটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেছিল তাতে রাশিয়ার পক্ষে এই দুটি রাষ্ট্রের প্রীতীয় ভালবাসায় আস্থা স্থাপন করা আর সম্ভব ছিল না। রাশিয়া তাই জোরেসোরেই আয়োজন শুরু করল পারমাণবিক বোমা তৈরির উদ্দেশ্যে। রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত—অন্তত রুশী সূত্র থেকে আমরা কোন তথ্য পাই নি। তবে পশ্চিমী সূত্র থেকে যে সব বৃত্তান্ত আমরা জেনেছি তাও কম চমকপ্রদ নয়।

যাহোক ফল কথা হল এই যে, যুক্তরাষ্ট্রের ঝানু প্রেসিডেন্ট ও ততোধিক ঝানু উপদেষ্টাদের ভবিষ্যৎবাণীকে নস্যাৎ করে ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে রুশীরা তাদের প্রথম সফল পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটালো। ১৯৪৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর ট্রুমান সাহেব তাঁর স্তম্ভিত দেশবাসীর কাছে ঘোষণা করলেন যে জনাকয়েক খ্যাপাটে বিজ্ঞানী বাদে অন্যান্য সবার প্রত্যাশাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া পারমাণবিক অস্ত্রের অবসান ঘটিয়েছে। মার্কিনীদের বিস্ময়ের মাত্রা এত বেশী ছিল যে এই ঘোষণায় তারা ঠিক বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি। মার্কিন সামরিক নেতারা রাশিয়ার এই সামর্থকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। আর তাদের এই অবিশ্বাসের সঙ্গত কারণ ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্তা ব্যক্তিদের ধারণা ছিল যে অন্তত এক দশকের আগে রাশিয়ার পক্ষে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি সম্ভব হবে না। মানহাট্টান প্রকল্পের কর্ণধার জেনারেল গ্রোভস যুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরে সিনেট কমিটিতে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছিলেন: 'অন্য দেশের সাহায্য ব্যতিরেকে রাশিয়ার পক্ষে

পারমাণবিক বোমা বানাতে সময় লাগবে পনের থেকে বিশ বছর, অন্য দেশের সাহায্য পেলেও সময়টা পাঁচ-সাত বছরের কম হবে না।' কিন্তু সবাইকে তাক লাগিয়ে চার বছরের ও কম সময়ের মধ্যে রাশিয়া পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হল। যুক্তরাষ্ট্র যতদিন এই অস্ত্রের একচ্ছত্র অধিপতি ছিল ততদিন এই পৃথিবীতে তার ছিল নিরঙ্কুশ আধিপত্য। সেই আধিপত্যের অবসান ঘটালো রাশিয়ার পারমাণবিক বিস্ফোরণ।

যাহোক, প্রাথমিক বিস্ময় ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর মার্কিনীরা উপলব্ধি করল যে মায়াময় যে আবেশে তারা চুর হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক বোমা যখনও পর্যন্ত পরীক্ষার পর্যায়ে উপনীত হয় নি সে সময় নীলস্ বোর ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে পারমাণবিক বোমা সম্বন্ধে মার্কিন-ব্রিটিশ কপটতা শেষ পর্যন্ত জন্ম দেবে এক ভয়াবহ পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার। কিন্তু 'চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী।' রাজনীতিবিদদের চরিত্র বিচারে এই বিংশ শতাব্দীতেও এই সুপ্রাচীন গ্রাম্য প্রবাদটির সত্যতা আবার প্রমাণিত হল।

যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগলিক অবস্থানটাই এ রকম যে তার বিরুদ্ধে বহিশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। তার পূর্বে ও পশ্চিমে বহুল বিস্তৃত সমুদ্র, উত্তরে ইউরোপের বন্ধুরাষ্ট্রসমূহ, দক্ষিণে দক্ষিণ আমেরিকার দুর্বল রাষ্ট্রগুলি। প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই যুক্তরাষ্ট্র যথেষ্ট সুরক্ষিত। তদুপরি তার পারমাণবিক ভাণ্ডারে তখন জমা হয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক বোমা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তার সামরিক ঘাঁটি। আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপনাস্ত্র তখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। সুতরাং রাশিয়ার পারমাণবিক বিস্ফোরণ সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সত্যিকার কোন বিপদ ছিল না। আসলে

banglainternet.com

কার্যসিদ্ধির জন্য পারমাণবিক বোমার যে চরম উপযোগিতার কথা ট্রুম্যান সাহেব লিখে গিয়েছিলেন সেই উপযোগিতা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল।

ক্ষণস্থায়ী দ্বিধার পর আমেরিকা পৃথিবীর নিধনযজ্ঞে তার শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করল। আর এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উপায় সেই ব্রহ্মাস্ত্র তৈরি যাকে সাধারণভাবে আমরা বলি হাইড্রোজেন বোমা এবং বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় গলন বোমা (fusion bomb)। অবশ্য কাণ্ডজ্ঞান সম্পূর্ণ অন্তর্হিত না হলে এটা বোঝা কঠিন ছিল না যে এই অর্জনও হবে খুবই ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু অপরিণামদর্শী রাজনীতিবিদদের পক্ষে দূরদর্শিতার দৃষ্টান্ত একান্তই বিরল বিশেষভাবে চার্চিল ট্রুম্যান গোষ্ঠির মত নেতারা নিজেদের শক্তির মদমত্ততায় এতখানি আচ্ছন্ন ছিলেন যে তাঁদের কাছে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির আশা করা বাতুলতা মাত্র।

সরকারীভাবে হাইড্রোজেন বোমা তৈরির উদ্যোগ পর্ব শুরু হয় ৫ই অক্টোবর, ১৯৪৯ সালে। রাশিয়া পারমাণবিক বোমার অধিকারী হওয়ার সাথে সাথেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু হাইড্রোজেন বোমার তত্ত্বীয় ধারণার বিকাশ ঘটেছিল প্রায় তিন দশক ধরে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে অ্যাস্টনের (Aston) হিসাব থেকে বোঝা গিয়েছিল যে হাল্কা পরমাণুর গলনে (fusion) প্রভূত শক্তি মুক্ত হবে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে রাদারফোর্ড, অলিফ্যান্ট এবং হারটেকের পরীক্ষাসমূহের দ্বারা এই তত্ত্ব সমর্থিত হয়েছিল। এই প্রভূত শক্তি মুক্ত করার মূলে সমস্যা হল উপাদানগুলিকে বহু নিযুত (million) ডিগ্রি তাপমাত্রায় উন্নীত করার সমস্যা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম কয়েক মাসে জার্মানরা ভেবেছিল যে প্রচলিত বিস্ফোরক ব্যবহার করে এই উচ্চ তাপমাত্রা সৃষ্টি করা সম্ভব হতে পারে এবং জার্মান সামরিক

গবেষণাগারে কিছু কিছু পরীক্ষা সংঘটিত হয়েছিল। এই পরীক্ষাগুলি থেকে সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়া যায় নি। বিভাজন বোমার (fission bomb) সাহায্যে যথেষ্ট উচ্চ তাপমাত্রা সৃষ্টি করে তার সাহায্যে গলন প্রক্রিয়ার সূচনা করার ধারণাটি ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের মাথা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দেই যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানী মহলে হাইড্রোজেন বোমার সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছিল। এডওয়ার্ড টেলারের বিবরণে জানা যায় যে কলম্বিয়ায় অবস্থানকালে একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর গবেষণাগারে ফেরার পথে ফার্মি বলেছিলেন: 'পারমাণবিক বোমা তৈরির সম্ভাবনা বর্তমানে যেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাতে এই বোমা বিস্ফোরণের দ্বারা সূর্যের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত বিক্রিয়ার মত কিছুর সূচনা করা কি সম্ভব নয়?' টেলর অচিরেই প্রারম্ভিক হিসাব তৈরি করেছিলেন এবং এরকম গলন বিস্ফোরণ সৃষ্টি যে সম্ভব তাতে নিশ্চিত হয়েছিলেন।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে শিকাগো থেকে লস্ এলামসে আসার পর তাঁর নেতৃত্বে চারটি গবেষক দল গঠন করা হয়েছিল। টেলরের অধীনস্থ দলটি নিয়োজিত হয়েছিল হাইড্রোজেন বোমার তত্ত্বীয় সমস্যাগুলির অধ্যয়নে, আর ইগন ব্রেট্‌সার (Egon Bretscher) এর অধীনে আর একটি দল নিযোজিত হয়েছিল এই বোমার গবেষণামূলক সমস্যাগুলির অধ্যয়নে।

চল্লিশের দশকের গোটা মধ্যম কালটায় ইউরেনিয়াম বোমা এবং ব্রহ্মাস্ত্র হাইড্রোজেন বোমার আলোচনা সমান তালে অগ্রসর হচ্ছিল। নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স-এর সংবাদদাতা উইলিয়াম লরেন্স লিখেছেন:

'প্রথম যখন হাইড্রোজেন বোমার কথা শুনলাম সে সময় আমি

banglainternet.com

যে আতঙ্ক ও অবিশ্বাস বোধ করেছিলাম এখনও পর্যন্ত তা আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ইউরেনিয়াম কিংবা প্লুটোনিয়াম বোমা তৈরি এমন কি পরীক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই, আসলে এটা আদৌ কার্যকর হবে কিনা তা জানার আগেই এই পারমাণবিক ব্রহ্মাস্ত্রের উল্লেখ আমার কাছে এমন উদ্ভট লেগেছিল যে মনে হয়েছিল ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য।'

এর পর ওপেনহাইমার পানির মত দেখতে এক শিশি স্বচ্ছ তরল লরেন্সকে দেখালেন। লরেন্স লিখেছেন :

'এটা ছিল প্রথম চরম ভারী পানির অত্যধিক লঘুকৃত ক্ষুদ্র নমুনা, ট্রাইটিয়াম ও অক্সিজেন দ্বারা তৈরি। এই পৃথিবীতে শুধু নয় এই সমগ্র বিশ্বে কোথাও পূর্বে এই জিনিষটি বিদ্যমান ছিল না। নীরবে আবিষ্ট বিস্ময়ে আমরা ঐ জিনিষটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। যদিও আমরা কথাবার্তা বলি নি, তবে উভয়েই জানতাম অপরজন কি ভাবছে। পানি কিংবা কোন ধরনের জীবনের অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে দুই শ' কোটি বছর আগে গ্যাসীয় অবস্থায় এই পৃথিবীতে যে বস্তুটি বিদ্যমান ছিল আমাদের চোখের সামনে আছে সেই পদার্থটি। আমাদের চিন্তার এ ধরনটি ছিল এ রকম, এখানে এমন একটি জিনিষ রয়েছে যা এই পৃথিবীটাকে পুনরায় সেই দুই শ' কোটি বছর পূর্বের অবস্থায় প্রত্যাবর্তন ঘটাতে সক্ষম।'

কিন্তু এইসব তত্ত্বীয় ও গবেষণালব্ধ ধারণাকে ব্রহ্মাস্ত্র বানানোর কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় রাশিয়ার সফল পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাথে সাথেই। রাশিয়ার পারমাণবিক বিস্ফোরণের লক্ষণাগুলি খুঁটিয়ে দেখার জন্য ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের সদস্যরা এক বৈঠকে মিলিত হলেন। স্ট্রস স্পষ্টভাবে জানালেন যে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব বজায়

রাখার জন্য এই ব্রহ্মাস্ত্র তৈরি অপরিহার্য। কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা ঠিক অতটা উৎসাহিত হলেন না। ফলে কমিশনের প্রধান বৈজ্ঞানিক বিভাগে (General Advisory Committee—G. A. C.) বিষয়টি পাঠানো হল। এই কমিটি ৩০শে অক্টোবর কমিশনের কাছে তাদের প্রতিবেদন পেশ করল। ওপেনহাইমার সহ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা শর্তহীন সুপারিশ করলেন যে 'ব্রহ্মাস্ত্র তৈরির সর্বাত্মক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা জোর সুপারিশ করছি।' তাঁদের এই সুপারিশের যুক্তি ছিল নিম্নরূপ :

"আমাদের সুপারিশের ভিত্তি হল এই বিশ্বাস যে ব্রহ্মাস্ত্র তৈরির প্রস্তাবে অন্তর্নিহিত রয়েছে মানব জাতির জন্য সেই ভয়াবহ বিপদ যার তুলনায় এই অস্ত্রের সামরিক সুবিধা নেহাতই অকিঞ্চিতকর। এটা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে এটি একটি চরম মারণাস্ত্র ; পারমাণবিক বোমা থেকে এর প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। একটি মাত্র বোমার সাহায্যে বিশাল অঞ্চলকে বিধ্বস্ত করার ক্ষমতা অর্জনই শুধু এই বোমা তৈরির যুক্তি। এর ব্যবহারের সাথে বিরাট সংখ্যক বেসামরিক নরনারী হত্যার সিদ্ধান্ত জড়িত। বড় রকমের সামান্য কয়েকটি চরম বোমার বিস্ফোরণঘটিত তেজস্ক্রিয়তা কি সম্ভাব্য জাগতিক প্রভাব ঘটাবে সেটা ভেবে আমরা আতঙ্কিত। চরম বোমা যদি আদৌ কার্যকর হয় তাহলে তার অন্তর্নিহিত বিধ্বংসী ক্ষমতার কোন সীমা থাকবে না। তাই এটা হবে গণহত্যার অস্ত্র।"

ওপেনহাইমার স্বাক্ষরিত এই প্রতিবেদনে আরও যে সব যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছিল তা হল এই ব্রহ্মাস্ত্র তৈরির উদ্দেশ্যে যে শ্রমসাধ্য কর্মসূচী গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে তাতে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত এটা সফল না হতেও পারে। পাঁচ লক্ষ টন টি, এন, টি, শক্তিসম্পন্ন যে বিভাজনী বোমা তৈরির কর্মসূচী

banglainternet.com

অনেকখানি এগিয়ে গেছে সেটা হিসাবের মধ্যে নিলে এই ব্রহ্মাস্ত্র হবে ব্যয়বহুল। প্রতিবেদনের স্বাক্ষরকারীরা সবশেষে যুক্তি দেখালেন: 'রাশিয়া এই অস্ত্র তৈরিতে সফল হতে পারে এই যুক্তি সম্বন্ধে আমাদের জবাব হল যে আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র কর্মসূচী তাদের পক্ষে কোন বাধা হবে না। তারা যদি ঐ অস্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে তাহলে বিভাজনী বোমার যে বিরাট ভাণ্ডার আমাদের আছে তার সাহায্যে এই ব্রহ্মাস্ত্রের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিশোধ গ্রহণ করা সম্ভব হবে।'

কমিশন ৯ই নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ট্রুমানের কাছে তাদের প্রতিবেদন পেশ করেছিল এবং পরদিনই প্রেসিডেন্ট এটিকে জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিলে পাঠালেন তাদের মতামতের জন্য। ১৯৫০ সালের জানুয়ারীর শেষের দিকে কাউন্সিলের বিশেষ কমিটি প্রেসিডেন্টের কাছে তাদের প্রতিবেদন পাঠালো। ৩১শে জানুয়ারীতে ট্রুমান এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সেই সিদ্ধান্তটি হল:

"পারমাণবিক গলন বোমার প্রাযুক্তিক সাধনযোগ্যতা নিরূপণের জন্য প্রয়াস চালানো হোক; পারমাণবিক শক্তি কমিশন এবং প্রতিরক্ষা বিভাগ যৌথভাবে এই প্রয়াসের হার ও মাত্রা নির্ধারণ করবে এবং একই সাথে পররাষ্ট্র বিভাগ এবং প্রতিরক্ষা বিভাগ সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্ভাব্য পারমাণবিক ক্ষমতার আলোকে জাতির বৈদেশিক ও প্রতিরক্ষা নীতিসমূহ পুনরীক্ষণ করবে।"

ট্রুমান সাহেবের এই সিদ্ধান্তের তৎপরতা বৃদ্ধির একটি সুযোগ এই সময় মার্কিন সরকারের হাতের মুঠোয় এসে গেল। ক্লস ফুক্স নামে একজন জার্মান বিজ্ঞানী ব্রিটেনে অভিবাসন গ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশ নাগরিকত্ব লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক ঘাঁটি

banglainternet.com

ক্লস এলামেসের অনেক তথ্য তাঁর জানা ছিল। কারণ একজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক প্রকল্পের সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হাইড্রোজেন বোমার সম্ভাবনা সম্বন্ধেও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল বলে মনে করা হয়েছিল। ১৯৫০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হল যে এই ক্লস ফুক্স ছিলেন একজন রাশিয়ার পক্ষের গুপ্তচর। খবরটি প্রকাশের সাথে সাথেই মার্কিন সামরিক বাহিনী হাইড্রোজেন বোমা ও তার নিক্ষেপক তৈরির জন্য সার্বিক প্রয়াসের দাবী জানাল।

১৯৫০ সালের ১লা মার্চ ট্রুমান জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের বিশেষ কমিটির অধিবেশন আহ্বান করলেন। কমিটি এবার সুপারিশ করল যে সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে হাইড্রোজেন বোমার উপর গবেষণা পরীক্ষার স্তরে উত্তীর্ণ করার মত প্রয়াস নিতে হবে এবং অবিলম্বে ট্রাইটিয়াম উৎপাদনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। শুধু এই উদ্দেশ্যেই বরাদ্দ করা হল দেড় বিলিয়ন ডলার (১৫০০ কোটি ডলার), অর্থাৎ পারমাণবিক বিভাজন বোমা তৈরির যাবতীয় খরচের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি পর্বে অর্থ, সম্পদ ও দক্ষতার দিক থেকে মার্কিনীরা বেশ সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। কিন্তু ১৯৪৯ সালের মধ্যেই রুশীরা পারমাণবিক ক্ষেত্রে এই পার্থক্যের মাত্রাকে অনেকখানি সংকুচিত করতে সমর্থ হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে এই ব্যবধান আরও হ্রাস পেয়েছিল।

১৯৫২ সালের নভেম্বরে টেলর-উলান নকশার ভিত্তিতে হাইড্রোজেন বোমার প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই পরীক্ষায় দশ মিলিয়ন টন বা এক কোটি টন টি, এন, টির তুল্য বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। তবে এই বিস্ফোরণকে ঠিক হাইড্রোজন বোমার পরীক্ষা

বলা চলে না। কারণ এই বিস্ফোরকের ওজন ছিল পয়ষট্টি টন, আর তাই এটাকে নিক্ষেপযোগ্য বোমা বলা চলে না।

১৯৫৩ সালের ১২ই আগষ্ট রুশীরা তাদের প্রথম হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। রুশীরা দাবী করেছিল যে তাদের এই বিস্ফোরণই পৃথিবীর সর্বপ্রথম হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা। কারণ ক্ষুদ্র আয়তনের এই বোমাটি ছিল বিমানে পরিবহনযোগ্য।

মার্কিনীরা সত্যিকার হাইড্রোজন বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল ১৯৫৪ সালের ১লা মার্চ। মনে করা হয়েছিল এই বিস্ফোরণের ধ্বংস-শক্তি হবে আট মিলিয়ন টন টি, এন, টির সমতুল্য, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল এই শক্তি পনর মিলিয়ন টন টি, এন, টির সমতুল্য। এই বিস্ফোরণের আঘাতে দুই শ' হাজার বর্গমাইল এলাকার সমুদয় প্রাণী সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। অর্থাৎ বাংলাদেশের মত চারটি দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হল সব রকম জীবন শুধুমাত্র একটি ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে। সাধে কি আর একে ব্রহ্মাস্ত্র বলা হয়!

এর পর থেকে দু'পক্ষই প্রায় সমানে সমানে এগিয়ে চললো। এ সেদিনও পর্যন্ত ইউরোপের যে দেশটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ছিল সবচেয়ে দুর্বল সেই রুশীরা অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানিতে মার্কিনীদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল যে, Anything you can do, we can do better.

অষ্টম অধ্যায়

মহাপ্রলয়ের সর্বাত্মক ব্যবস্থা

এ যাবত যে কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে সেটি পারমাণবিক বোমার ইতিহাস। অবশ্য বেশি পুরান ইতিহাস নয়, মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগের ঘটনা। পণ্ডিতদের মতে ইতিহাসের শিক্ষা কেউ গ্রহণ করে না। তাহলে এই পণ্ডশ্রমের কি উদ্দেশ্য? মানুষের মূঢ়তার সেই সনাতন ধারাকে নব নব রূপে প্রত্যক্ষ করে নীরবে হাসা? পতঙ্গের তুল্য যে অন্ধভাবে আগুনে ঝাঁপ দেয় তাকে বলা হয় পতঙ্গবৃত্তি। গ্রহ নক্ষত্র আর সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত যার অবাধ গতিবিধি সেই বিজ্ঞ মানব একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় উপস্থিত হয়ে ও কি এই পতঙ্গবৃত্তির উর্ধে উঠতে সমর্থ হয়েছে? ভাবীকালে এর জবাব পাওয়া যাবে। অবশ্য তখন সেই জবাবটা জানার জন্য কোন উৎসাহী মানব সন্তান এই ধরনীতে বেঁচে থাকবে কিনা তাও এখন বলা যাচ্ছে না। তবে তাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই কারণ খেদ করার জন্য আমার আপনার মত কেউ তো আর তখন অবশিষ্ট থাকবে না।

যাহোক আমরা আবার আমাদের পুরান আলোচনায় ফিরে যাব। পূর্বের অধ্যায়গুলিতে আমরা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির প্রারম্ভিক ঘটনাগুলিই সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। হিরোশিমায় প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর প্রায় একচল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই চার দশকের ব্যবধানে পারমাণবিক অস্ত্রের যে গুণগত ও পরিমাণগত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তার তুলনায় হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত সেই প্রথম

banglainternet.com

পারমাণবিক বোমাটিকে তুলো ভরা কোল বালিশ বললে অত্যুক্তি হবে না।

পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে সফল হলেই পারমাণবিক শক্তি হওয়া যায় না। এই অস্ত্র লক্ষ্যস্থলে পাঠানোর জন্য চাই উপযুক্ত ক্ষেপক। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে মনুষ্যচালিত বোমারু বিমানের সাহায্যে যেভাবে বোমা ফেলা হয়েছিল সেটা নিতান্তই সেকেলে। র‍্যাডারের সাহায্যে এর গতিপথ নির্ণয় করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর পূর্বে এই বিমানকে ঘায়েল করা সম্ভব। সব দিক বিবেচনা করে পরাশক্তিরা তাই ত্রিবিধ ক্ষেপণ প্রণালী উদ্ভাবন করেছে। বোমারু বিমানকে আধুনিকায়ন করে বহাল রাখা হয়েছে। কারণ যতই সেকেলে হোক পাকা বাঁশের মত এর বেশ কিছু গুণ হেলা করার মত নয়। বোমারু বিমানকে দূর ও নিকট পাল্লায় ব্যবহার করা চলে এবং এদের বহন ক্ষমতাও সহজবশ্য। যোগাযোগ উপগ্রহের কল্যাণে এরা খুব কম সময়ের মধ্যে লক্ষ্যস্থল পরিবর্তন করে সঠিক নিশানায় বোমা বর্ষণ করতে সমর্থ।

দ্বিতীয় প্রণালীটিকে বলা হয় আন্তঃ-মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র (Inter continental Ballistic Missile-ICBM)। স্থলভিত্তিক এই প্রণালীর বৈশিষ্ট্য অনেকগুলি। এদের উড্ডয়ন সময় কম, শত্রুর বাঁধা ভেদ করে সঠিক নিশানায় উচ্চ শক্তিময় পারমাণবিক বিস্ফোরক নিক্ষেপে সমর্থ। এদের নিশানা দ্রুত পরিবর্তনীয়, খুব কম সময়ের মধ্যে পূর্ণ সতর্কাবস্থায় আনা যায় এবং ভূগর্ভস্থ সাইলোতে (*Silo*) রক্ষিত হলে উৎক্ষেপণপূর্ব সময়ে বেশ উদ্‌বর্তন ক্ষমতা রাখে। অবশ্য বর্তমানে উন্নত ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রের ক্রমবর্ধমান সঠিক নিশানা এই উদ্‌বর্তন ক্ষমতা অনেকখানি খর্ব করেছে।

তৃতীয় প্রণালীটি সবচেয়ে আধুনিক সাবমেরিন নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র

(Submarine Launched Ballistic Missile-SLBM)। এটি সমুদ্র ভিত্তিক প্রণালী, ফলে ক্রিয়াকুশলতা এবং উদ্‌বর্তন ক্ষমতার সবচেয়ে উপযোগী মিলন হয়েছে এই প্রণালীতে। পানিতে নিমজ্জিত সাবমেরিন থেকে এই অস্ত্র উৎক্ষেপণ করা হয়। যেহেতু ডুবন্ত অবস্থায় সাবমেরিনের গতিপথ অনুসরণ দুরুহ, তাই শত্রুর পূর্বাঘাতের দ্বারা এই ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষতির সম্ভাবনা খুবই সামান্য। শত্রুর আক্রমনের পর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রত্যাঘাত হানতে এটি সবচেয়ে উপযোগী।

স্থল বা সাবমেরিন থেকে ক্ষেপনীয় ব্যালিস্টিক মিসাইল এবং ক্রুজ মিসাইল যুদ্ধবিদ্যায় বিপ্লব ঘটিয়েছে। এই ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র জমিতে চলমান উৎক্ষেপণ মঞ্চ থেকে, সাবমেরিন বা যুদ্ধজাহাজ থেকে অথবা উড়ন্ত বিমান থেকে নিক্ষেপ করা যায়।

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের মত দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ন' হাজার পাঁচ শ' মাইল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। এই ক্ষেপণাস্ত্র মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়, সেখান থেকে যুদ্ধশির (Warhead) বক্র পথ অনুসরণ করে ঠিক লক্ষ্যবস্তুর উপরিস্থ বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং তারপর স্বাধীনভাবে লক্ষ্যবস্তুটির উপর পড়ে। এই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র এক বা একাধিক আট-দশটি পর্যন্ত যুদ্ধশির বহণ করতে পারে যার প্রতিটি শত শত মাইল ব্যবধানে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানতে সক্ষম। শত্রুর র‍্যাডার এবং ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী ব্যবস্থাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এই উৎক্ষেপকে থাকে কয়েকটি টোপ।

পারমাণবিক অস্ত্র সঠিক লক্ষ্যস্থলে প্রেরণের এই রকমারি পাকা বন্দোবস্তের পর স্বভাবতই জানতে ইচ্ছে হয় এই পরাশক্তিদ্বয়ের মজুত ভাণ্ডারে কি পরিমাণ ক্ষেপক ও অস্ত্র মজুত রয়েছে। কোন দেশই তার অস্ত্র ভাণ্ডারের বিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশ করে না।

banglainternet.com

বিষয়টা খুবই গোপনীয়। তা সত্ত্বেও অস্ত্রবিশেষজ্ঞরা নানা বৈজ্ঞানিক পন্থায় এবং কখনও কখনও গুপ্তচর মারফত এই মজুত ভাণ্ডারের হিসাব বের করতে সফল হয়েছেন। হিসাবটা একেবারে যথাযথ না হলেও মোটামুটি সঠিক বলে ধরা যায়—মজুত অস্ত্রের পরিমাণ এই হিসাবের চেয়ে বেশী হতে পারে, কিন্তু কম হওয়ার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। হিসাবটা নিম্নরূপ :

যুক্তরাষ্ট্র

প্রণালী	মোতায়েনকৃত সংখ্যা	মোট যুদ্ধশির	ধ্বংসশক্তি/মেগাটন (টি এন টি)
আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র	১০৪০	২১৪০	২১৬১
সাবমেরিন উৎক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র	৫৭০	৫৫৪০	
বোমারু বিমান	৩০০	২০৪০	১৫৬৬
মোট	১৯১০	৯৭২০	৩৭২৭

সোভিয়েত রাশিয়া

প্রণালী	মোতায়েনকৃত সংখ্যা	মোট যুদ্ধশির	ধ্বংসশক্তি/মেগাটন (টি এন টি)
আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র	১৪০০	৫৩৩০	৫৮০৫
সাবমেরিন উৎক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র	৯৫০	২০১০	
বোমারু বিমান	৩৪০	৭০০	৭০০
মোট	২৬৯০	৮০৪০	৬৫০৫

উপরের সারণী থেকে দেখা যায় ক্ষেপকের সংখ্যায় রাশিয়া এগিয়ে থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের আছে অধিক সংখ্যক যুদ্ধশির। অবশ্য রাশিয়ার যুদ্ধশিরগুলি অধিক শক্তিসম্পন্ন, আর তাই মোট ধ্বংস শক্তিতে

রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে অতিক্রম করে গেছে। দুই পরাশক্তির হাতে যে পারমাণবিক অস্ত্র মজুত আছে তার ধ্বংস শক্তি সাকুল্যে ১০, ২৩২ মেগাটন টি. এন. টির সমতুল্য। স্মর্তব্য যে এক মেগাটন অর্থ দশ লক্ষ টন।

এই যুদ্ধশিরগুলিই আসলে ব্রহ্মাস্ত্র। অবশ্য ব্রহ্মা বা জগৎস্রষ্টা এগুলি তৈরী করেন নি। জগৎপিতার দুরাত্মা সন্তানদেরই সৃষ্টি এই সব মারণাস্ত্র। বিভিন্নভাবে ক্ষেপণযোগ্য এই ব্রহ্মাস্ত্রগুলির ধ্বংসশক্তি প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা রুশীদের এস. এস—২০ (SS—20) ক্ষেপণাস্ত্রটির উল্লেখ করতে পারি। এর পাল্লা চার হাজার ছ' শ' মাইল। এর তিনটি মডেল। এক নম্বর মডেল একটি মাত্র যুদ্ধশির বহনে সক্ষম যার শক্তি দেড় মেগাটন (পনর লাখ টন) টি. এন. টির সমতুল্য। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বিখ্যাত (শত্রুর কাছে কুখ্যাত) ক্ষেপণাস্ত্র হল পার্শিং (Pershing) ক্ষেপণাস্ত্র। এর পাল্লা এক শ' থেকে সাড়ে চার শ' মাইল। এদের ধ্বংসশক্তি চার শ' কিলোটন পর্যন্ত হতে পারে। সম্প্রতি এই অস্ত্র পশ্চিম জার্মানী ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে মোতায়েন করা হয়েছে রাশিয়ার বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর উপর তাক করে। একইভাবে এস. এস—২০ তাক করা আছে প্রধানত পশ্চিম ইউরোপ, জাপান এবং চীনের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর উপর।

আমরা বিস্ফোরণের শক্তি বোঝাতে 'টি. এন. টি' শব্দটি বেশ কয়েক স্থানে ব্যবহার করেছি। আসলে ট্রাইনাইট্রোটলিউঈনের সংক্ষিপ্ত রূপ হল টি. এন. টি (TNT)। এটি একটি উচ্চ বিস্ফোরক রাসায়নিক যৌগ। পৃথিবীর দুই পরাশক্তির অস্ত্রাগারে যে বিপুল ধ্বংশক্তির মজুত গড়ে উঠেছে তার একটা মোটামুটি হিসাব আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই মজুত ভাণ্ডার থেমে

banglainternet.com

নেই, প্রতিদিন এটা স্ফীত হচ্ছে, আর ক্রমাগত উন্নত করা হচ্ছে তাদের গুণগত মান। কোন দেশের সামরিক ক্ষমতা তাই অস্ত্রের ধ্বংসশক্তি এবং তার গুণগত মানের যাথার্থ সমন্বয়ের উপর নির্ভরশীল। শহর, শিল্পাঞ্চল ইত্যাদির মত বিস্তৃত অঞ্চল ধ্বংসের জন্য অস্ত্রের ধ্বংস ক্ষমতাটাই প্রধান বিবেচ্য। কিন্তু শত্রুর ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র প্রভৃতি স্বল্প পরিসরের লক্ষ্যবস্তুকে ঘায়েল করার জন্য অধিক প্রয়োজন অস্ত্রের সঠিক নিশানা। অস্ত্রের ধ্বংস ক্ষমতার দিক থেকে রাশিয়া এগিয়ে থাকলেও গুণগত মানের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র অধিক উন্নত বলে ধারণা করা হয়। অবশ্য এই ব্যবধান খুব দ্রুত বিলীন হচ্ছে।

আমরা যারা বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ বা সামরিক বিশেষজ্ঞ নই তাদের পক্ষে পরমাণু অস্ত্রের তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব হবে যদি এক মেগাটন শক্তিসম্পন্ন একটি পারমাণবিক অস্ত্রে ভৌতিক এবং জৈব প্রভাবগুলি খতিয়ে দেখি।

ভৌত প্রভাব :

দশ লক্ষ বা ততোধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট একটি শহরের উপর একটি মাত্র এক-মেগাটন বোমা বিস্ফোরিত হলে তৎক্ষণাৎ প্রায় আড়াই লাখ লোক নিহত হবে এবং অবশিষ্ট অনেকেই পরে মারা যাবে। এরকম কিছু পূর্বে ঘটেনি। তা সত্ত্বেও এটি একটি রূঢ় বাস্তবতা। মার্কিনী, রুশীয় এবং ব্রিটিশদের বেশ কিছু বিশ্লেষণ থেকেই এই হিসাবটি তৈরী হয়েছে।

পারমাণবিক বোমা মাটি থেকে কিছু উঁচুতে বিস্ফোরিত হয়। হিরোশিমায় যে প্রথম পরমাণু বোমাটি ফেলা হয়েছিল সেটি এক হাজার ফুট উপরে বিস্ফোরিত হয়েছিল। পৃথিবীর যে বিন্দুর উপর

শূন্যে বোমাটি বিস্ফোরিত হয় তাকে বলা হয় 'শূন্য ভূমি' (Ground zero)। এই শূন্য ভূমিকে ঘিরে বহুদূর পর্যন্ত যে ধ্বংসযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তার কিছু নমুনা আমরা এভাবে বর্ণনা করতে পারি।

আলোর ঝিলিক

পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রথম প্রকাশ হল দৃষ্টিনাশক আলোর ঝিলিক। শূন্যভূমি থেকে এক শ' মাইলের মধ্যে অবস্থিত কোন ব্যক্তি সরাসরি এই ঝিলিকের দিকে তাকালে সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে যাবে।

তাপ

পারমাণবিক বিস্ফোরণ এমন উচ্চ তাপমাত্রা সৃষ্টি করে যা সূর্যের কেন্দ্রস্থিত তাপমাত্রার সমান। বিভাজন বোমার (Fission bomb) সৃষ্ট তাপমাত্রা এক মিলিয়ন সেলসিয়াসের কয়েক দশ গুণ হতে পারে। মাত্র ২৭৪০ সেলসিয়াসে এমন যে শক্ত লোহা তাও বাষ্পে পরিণত হয়। অতএব এটা সহজেই কল্পনা করা যায় যে বিস্ফোরণ মুহূর্তে পারমাণবিক বোমার যাবতীয় পদার্থ গ্যাসে রূপান্তরিত হবে। বিস্ফোরণের শতকরা ৩৫ ভাগ শক্তি তাপরূপে নির্গত হয়। এই তাপ সেকেণ্ডে এক লাখ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে চতুর্দিকে ধাবিত হয় এবং বিস্ফোরণ বিন্দুর নিচে কাছাকাছি সব পদার্থকে এবং শূন্যভূমির তিন মাইল পরিধির মধ্যে সব কিছুকে বাষ্পায়িত করে। আটমাইল পরিধির মধ্যে বহু পদার্থ সেই দাবানলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জ্বলে উঠবে। এগার মাইলের মধ্যে খোলা স্থানে অবস্থিত সব প্রাণীই প্রচণ্ডভাবে অগ্নিদগ্ধ হবে। বিশ মাইল পরিধির মধ্যে উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত সব প্রাণীই অল্পবিস্তর দগ্ধ হবে।

banglainternet.com

প্রবল বাত্যা

বিস্ফোরণের মুহূর্তে কয়েক নিযুত সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বোমার সমুদয় পদার্থ গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। অস্ত্রের উপাদানগুলি যেটুকু স্থান অধিকার করেছিল আদিতে, বিস্ফোরণ মুহূর্তে গ্যাসেরাও ঐটুকু স্থানে রুদ্ধ থাকে। ফলে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের দশ লক্ষ গুণেরও বেশি চাপ সৃষ্ট হয়। এই দারুণ উত্তপ্ত অস্ত্রের অবশিষ্টাংশ বিপুল শক্তি বিকিরণ করে, প্রধানত একস্-রশ্মি রূপে। আর এই বিকিরণ মিশে যায় আশেপাশের বায়ুমণ্ডলে।

এক মেগাটন পারমাণবিক অস্ত্রের প্রধান বিধ্বংসী প্রভাবের কারণ এই প্রচণ্ড উচ্চ চাপ। এই উচ্চ চাপ জন্ম দেয় প্রবল বাত্যা বা অভিঘাত তরঙ্গের (Shock waves)। বায়ুমণ্ডলের চাপ মোটামুটি প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পনর পাউণ্ড। বিস্ফোরণের ফলে শূন্যভূমির দেড় মাইলের মধ্যে এই চাপ মোটামুটি ত্রিশ গুণ বেড়ে যায়। বিস্ফোরণের আধাআধি শক্তি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এক প্রবল বাত্যার সাহায্যে যার গতি শব্দের গতির চেয়েও দ্রুত। ফলে বিস্ফোরণের পনর সেকেণ্ডের মধ্যেই চার মাইল পরিধির মধ্যে (শূন্য ভূমিকে কেন্দ্র করে) সব ইটের বাড়ি ধ্বসে পড়বে। ঘণ্টায় সাত শ' মাইল বেগের বায়ুপ্রবাহে এই ভেঙে পড়া ঘরবাড়ি ও মৃতদেহগুলিকে সজোরে শূন্যে নিক্ষেপ করতে থাকবে। পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত হবে নারকীয় নাটকের মহড়া।

তড়িচ্চুম্বকীয় স্পন্দন

তড়িচ্চুম্বকীয় স্পন্দনে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেডিও, টেলিভিসন, র‍্যাডার, কমপিউটর এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ সাংঘাতিক রকম ক্ষতিগ্রস্থ হবে। মাটির যত ঊর্ধ্বে বোমাটি বিস্ফোরিত হবে ঠিক

সেই অনুপাতে এই স্পন্দন শক্তিশালী হবে এবং বহুদূরব্যাপী এসব ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করবে।

ফলআউট (Fallout):

বিস্ফোরণ মুহূর্তে নির্গত প্রধানত নিউট্রন ও গামা রশ্মির শক্তিশালী স্পন্দনের চেয়েও মারাত্মক বিপদের কারণ বিরতিহীন অবশিষ্ট বিকিরণ, এমন কি যখন বিস্ফোরণের অন্য সব প্রভাবের অবসান ঘটেছে। আদিতে তীব্র তাপে যেসব পদার্থ বাষ্পায়িত হয়েছিল তাপ কমলে সেগুলি আবার ঘণীভূত হয়ে কঠিন কণাযুক্ত তেজস্ক্রিয় ধুলায় পরিণত হয়। বৃহত্তর এবং ভারী কণাগুলি বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মাটিতে পড়ে এবং খুব সম্ভবত লক্ষ্যস্থলের উপর কিংবা তার কাছাকাছি নিম্নাঞ্চলে পড়ে। কিন্তু আনুবিক্ষনিক কণায় ভরা অবশিষ্ট ধুলা পৃথিবীতে নেমে আসতে কয়েক সপ্তাহ এমন কি কয়েক মাস সময় নিতে পারে। বায়ুপ্রবাহ এবং আবহাওয়ার অবস্থার উপর এটা নির্ভর করে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণজনিত এই 'ফলআউট' (Fallout) ধূলিকণায় থাকে দু'শ রকমের তেজস্ক্রিয় মৌল। এই মৌলগুলি রেডিয়োআইসোটোপ নামে পরিচিত। জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় এই ভুল ধারণার বসে দেহ এই তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি মজুত করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সুস্থ অস্থি কাঠামো গড়তে এবং রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় যে ক্যালসিয়াম ঠিক অনেকটা তারই মত স্ট্রনশিয়াম—৯০, যেটা বিটা কণায় এবং গামা রশ্মিতে দৃষ্ট হয়। এই মৌলটি দেহ কোষে মিউটেশন ঘটাতে এবং ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। আলফা কণার দ্বারা বাহিত ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম আইসোটোপগুলি যকৃত, বৃক্ক (Kidney) এবং লসিকানালীর মত প্রাণরক্ষাকারী অঙ্গকে

banglainternet.com

ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই আইসোটোপগুলি বিশেষভাবে বিপজ্জনক এই কারণে যে হাজার হাজার বছর পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ব্যাপী এগুলি তাদের বিকিরণ অব্যাহত রাখে। তাই বিস্ফোরণজনিত তাৎক্ষণিক মৃত্যু ও ধ্বংসের পাশাপাশি এই দীর্ঘমেয়াদী বিকিরণজনিত বিপদ সর্বক্ষণের জন্যই জীবিত মানুষের কাছে হয়ে থাকে বিভীষিকা।

ভেষজ প্রভাব (Medical Effects) :

বিকিরণে আধেয় কণার সংমিশ্রণের প্রকৃতি অনুযায়ী বিকিরণের ভেষজ প্রভাবের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। প্রধান চার রকমের বিকিরণ হল : আলফা, বিটা, গামা এবং নিউট্রন।

আলফা কণা দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন সমন্বয়ে গঠিত। এর ভর চার একক এবং বৈদ্যুতিক চার্জ দুটি পজিটিভ একক। আলফা কণা দেহ কোষে এক মিলিমিটার পর্যন্ত ঢুকতে পারে। কিন্তু নিঃশ্বাসের মাধ্যমে কিংবা খাদ্যের মাধ্যমে পাকস্থলিতে প্রবেশ করলে এই কণা ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে।

বিটা কণার ভর এবং বৈদ্যুতিক চার্জ একটি ইলেকট্রনের সমান। আলফা কণার মত বাতাসে চলাচলকালে তাদের জীবনকাল সীমিত এবং তারা সব চেয়ে মারাত্মক যখন নিঃশ্বাস বা খাদ্যের মাধ্যমে পাকস্থলিতে প্রবেশ করে। এ ছাড়াও এই কণা চামড়ায় বিটা দগ্ধতা ঘটায়।

গামা রশ্মি হল উচ্চ ফোটন শক্তির তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ যার কোন ভর বা চার্জ নেই। তারা অনেকটা একস্ রশ্মির মত, কিন্তু তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ ক্ষুদ্র হওয়ায় অনেক বেশি শক্তিসম্পন্ন। সমাহৃত গামা রশ্মি কয়েক ইঞ্চি পুরু কংক্রিট ভেদ করতে পারে। তাই জীবন্ত কলা (living tissues) এই রশ্মিকে আদৌ প্রতিরোধ করতে পারে না। এরা দেহের পরমাণু থেকে ইলেকট্রন মুক্ত করে।

নিউট্রন একটি অক্রিয় কণা যার কোন বৈদ্যুতিক চার্জ নেই। নিউট্রন দেহের মাংস ভেদ করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। দেহের পারমাণবিক কণার সাথে মিথস্ক্রিয়া ঘটিয়ে তারা আরও বিকিরণ সৃষ্টি করে।

বিকিরণ এই পৃথিবীতে একটি বিরতিহীন ঘটনাধারা। নক্ষত্র থেকে মহাজাগতিক রশ্মি এবং পৃথিবীর ভেজস্ক্রিয় মৌলগুলি ছাড়াও পারমাণবিক পরীক্ষা ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত রেডিয়োআইসোটোপগুলো বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করে। এরা সবাই বিভিন্ন ধরনের বিকিরণ ঘটায়। কিন্তু পারমাণবিক বিস্ফোরণজনিত বিকিরণের তুলনায় এই পরিবেশগত বিকিরণের মাত্রা নিতান্তই নগণ্য। বিস্ফোরণজাত তীব্র বিকিরণ সুদীর্ঘ সময় ব্যাপী বিপজ্জনক হয়ে ওঠে মানুষের পক্ষে কারণ চামড়ার সাথে সংযোগ, নিঃশ্বাস এবং বিকিরণ আক্রান্ত খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে ঐ বিকিরণ প্রাণীদেহকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

সুস্থির, গুপ্ত এবং ছলনাময়ী ঘাতক এই বিকিরণ। এদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে না পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে প্রাণঘাতী মাত্রায় বিকিরণ গ্রহণ করেও গ্রাহক কিছুই টের পায় না। ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে তৎক্ষণাৎ কিংবা কয়েকদিন যন্ত্রণাদায়ক ভোগান্তির পর।

যেহেতু এই বিকিরণ দেহ কলায় (body tissues) অবস্থিত মৌলসমূহের বৈদ্যুতিক চার্জে পরিবর্তন ঘটিয়ে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আহিত স্থূলাণু (ions) সৃষ্টি করে তাই কখও কখনও এটাকে বলা হয় 'স্থূলাণুকারী বিকিরণ'। জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যে রাসায়নিক পদার্থগুলি দেহের জীবনদায়ক বিক্রিয়াগুলির সূচনাও রক্ষা করে, বিকিরণ সেই উৎসেচকসমূহের (enzymes) প্রকৃতিতে

banglainternet.com

পরিবর্তন ঘটায়। স্থূলান্ত্রকারী বিকিরণের তাৎক্ষণিক প্রভাব হল জীবন্ত কোষে অত্যাধিক শক্তি সঞ্চারণ। বিকিরণ মাত্রা তীব্র হলে গ্রাহক দ্রুত দুর্বল ও নিঃশেষিত অবস্থায় পৌঁছে। তারপর ত্বরাক্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত হয়ে সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই মারা যায়।

রক্ত তৈরির জন্য অপরিহার্য অস্থি মজ্জা বিকিরণের প্রতি বিশেষ-ভাবে সুবেদী। ফলে লোহিত রক্ত কণিকা কমে যাওয়ায় রক্তহীনতা দেখা দেবে। শ্বেত রক্ত কণিকা সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করে এবং এটা অণুচক্রিকা (রক্তমধ্যস্থ অতি ক্ষুদ্র পর্দাবিশেষ) তৈরীর জন্যও দরকারী। এই অণুচক্রিকাদের কারণে রক্তচাপ বাঁধে এবং ফলে শোণিতস্রাব নিবৃত্ত হয়। এটার ঘাটতি হলে আক্রান্ত ব্যক্তি রক্ত-পাতের ফলে মারা যেতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যাহত হওয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি যে কোন সংক্রামক রোগের প্রকোপে হঠাৎ মারা যাবে। কোন স্বাস্থ্যবান লোকের জন্য যে রোগ মামুলী অসু-স্থতার কারণে প্রতিরোধ ক্ষমতার নষ্ট হলে সেই রোগই হয়ে ওঠে প্রাণঘাতী।

বিকিরণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দীর্ঘকালীন প্রভাব হল বর্ধিত হারে লিউকীমিয়া (leukaemia) রোগের প্রাদুর্ভাব। এটি একটি প্রাণনাশক রোগ যাতে দেহের শ্বেত রক্ত কণিকার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। হিরোশিমায় বোমা বর্ষণের আধা মাইল কেন্দ্রের মধ্যে যারা ছিল তাদের বেলায় এই রোগের সম্ভাবনা অন্যান্যদের তুলনায় ষাটগুণ বেশি।

একটি মাত্র এক মেগাটন শক্তিসম্পন্ন বোমা বিস্ফোরণে কি ভয়ংকর ক্ষয়ক্ষতি হবে তার কিছু পরিচয় আমরা এতক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। পারমাণবিক যুদ্ধ যদি আদৌ কখনও শুরু হয় তাহলে ঝাঁকে ঝাঁকে হাজার হাজার পরমাণু অস্ত্র বৈরী শক্তিগুলি পরস্পরের

উপর বর্ষণ করবে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে এই যুদ্ধ সীমিত থাকবে প্রধানত উত্তর গোলার্ধে অর্থ ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় তাহলে আমরা যারা দক্ষিণ গোলার্ধের অধিবাসী তারা কি এই ভয়াবহ যুদ্ধের প্রভাব থেকে রেহাই পাব? আমাদের বর্তমান অবস্থাটা অনেকটা 'নুন আনতে পান্তা ফুরানোর' মত। এমনিতেই শতেক জ্বালায় আমরা ধুঁকে ধুঁকে মরছি। আর তথাকথিত উন্নত রাষ্ট্রগুলিও আমাদের প্রতি এমন আচরণ করছে না যে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমাদের মস্তক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কাজেই প্রশ্ন উঠতে পারে ইউরোপ আমেরিকার এই যুদ্ধে আমাদের এত মাথা ব্যথার কি কারণ? বরঞ্চ ঐ হিংস্র নরখাদকেরা পরস্পরকে ভক্ষণ করে যদি নিঃশেষ হয়ে যায় তাতে আমাদের অশ্রু বর্ষণের পরিবর্তে বরং খুশি হওয়াই উচিত। পৃথিবী বিপুলা, তার দুরাত্মা সন্তানেরা নিজেদের দোষে ধ্বংস হয়ে গেলে তার কোন খেদ নেই।

দুরাত্মা সন্তানেরা ধ্বংস হোক, যারা খোদার উপর খোদগারি করে তাদের ধ্বংস অবধারিত। ধর্মভীরু অহিংস নিপাট ভালো-মানুষ আমরা। পারমাণবিক যুদ্ধ সংঘটিত হলে করুণাময় ঈশ্বরের দয়ায় আমরা কি রেহাই পাব? বিজ্ঞানীদের এক সমীক্ষা থেকে জবাবটা পাওয়া যাবে আর তাই সেটি উদ্ধৃত হল:

"ওয়াশিংটন, ১৩ই সেপ্টেম্বর (১৯৮৫)/রয়টার।—পারমাণবিক যুদ্ধের ফলে ২৫০ কোটি লোক অনাহারে মারা যেতে পারে। যেসব দেশ এ যুদ্ধে অংশ নেবে না, তারাও এতে রেহাই পাবে না। গতকাল প্রকাশিত এক বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় একথা জানানো হয়।

বিশ্বের তিন শ' বিজ্ঞানী দু'বছর ধরে ঐ সমীক্ষা চালান। এর উপসংহারে বলা হয়, পারমাণবিক যুদ্ধের ফলে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই অনাহারের কবলে পড়বে।

banglainternet.com

পরিবেশের সমস্যা বিষয়ক বৈজ্ঞানিক কমিটির (স্কোপ) রিপোর্টে এ সংক্রান্ত আগেকার সমীক্ষাগুলোর বক্তব্যকে সমর্থন করা হয়। ঐ সব সমীক্ষায় বলা হয়েছিল পরাশক্তিগুলির মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধে বায়ুমণ্ডলে দশ কোটি টন ঝুল পড়বে। রিপোর্টে বলা হয়, এ ঝুল আলো ও তাপ বিকিরণের পথ বন্ধ করে দেবে। ফলে যে 'পারমাণবিক শৈত্যপ্রবাহ' শুরু হবে, তাতে ভয়াবহ শস্য বিপর্যয় ঘটবে।

রিপোর্টে বলা হয়, বোমা বিস্ফোরণ ও তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবের তুলনায় অনাহারেই অনেক বেশি লোক মারা যেতে পারে।

রিপোর্টের অন্যতম প্রণেতা কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মার্ক হারওয়েল সাংবাদিকদের বলেন, কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে কোন পারমাণবিক যুদ্ধ বাধলে, এ দুটো দেশে মোট যতজন মারা যাবে, তার চেয়ে ভারতে আরো বেশি লোক মারা যেতে পারে। ইউরোপের তুলনায় আফ্রিকাতে অনাহারে আরো বেশি লোকের মৃত্যু হতে পারে।

পারমাণবিক শৈত্য প্রবাহে কিছুকাল ধরে ভারতে মৌসুমী বায়ু প্রবাহ এবং গ্রীষ্মমণ্ডলের সর্বত্র বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে ফসলহানি ঘটবে। ভারতের অধিকাংশ লোকই মারা যেতে পারে বলে ওই সমীক্ষায় বলা হয়।

এতে উল্লেখ করা হয়, চীনে কোন পারমাণবিক বোমা না পড়লেও সে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, চীনের এক বছরেরও কম সময়ের খাদ্য মজুদ আছে।

পারমাণবিক যুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নে যারা বেঁচে থাকবে, তারাও একইভাবে বিপদগ্রস্ত হবে। কারণ, সে দেশেও এক বছরের কম সময়ের খাদ্য মজুদ আছে।

উন্নয়নশীল বিশ্বের সমস্যাদিও বিরাটভাবে বেড়ে যাবে। কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মত বড় বড় শস্য উৎপাদনকারী দেশ থেকে পণ্য রপ্তানী বন্ধ হয়ে যাবে।

একমাত্র পণ্য আমদানি করতে না করার কারণেই জাপানের অর্ধেকেরও বেশি লোক অনাহারের কবলে পড়তে পারে বলে সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়।

পারমাণবিক যুদ্ধের ফলে পারমাণবিক শৈত্য প্রবাহ শুরু হবে। এ ব্যাপারে সব বিজ্ঞানী একমত নন। এডোয়ার্ড টেলর বলেন, ওইসব সমীক্ষা এখনো পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে নি। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হাইড্রোজেন বোমা উদ্ভাবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

স্কোপ-এর রিপোর্টে আগেকার কয়েকটি সমীক্ষার এক অভিমত নাকচ করে দেয়া হয়। পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে যে দাবানলের সৃষ্টি হবে, তাই পারমাণবিক শৈত্য প্রবাহের অন্যতম বড় কারণ হবে বলে ঐ সব সমীক্ষায় বলা হয়েছিল।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, দাবানল নয়, বরং শহুরে এলাকাগুলোতে বোমা বিস্ফোরণের ফলে বায়ুমণ্ডলে যে কালো ঝুল পড়বে তাই শৈত্য প্রবাহের প্রধান কারণ হবে।

স্কোপ সমীক্ষা গোষ্ঠীর ব্রিটিশ চেয়ারম্যান স্যার ফ্রেডারিক ওয়ার্ণার বলেন, পারমাণবিক শৈত্য প্রবাহের আশঙ্কা কোন দেশকে আণবিক যুদ্ধ শুরু করা থেকে বিরত রাখতে পারে।"

banglainternet.com

পরিশিষ্ট

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। নেহাতই গ্রাম্য প্রবাদ। কিন্তু কি খাঁটি সত্য। এই উপমহাদেশের কোথাও যদি কোন পারমাণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত না হয় তাহলেও পারমাণবিক যুদ্ধের পরিবেশগত প্রভাবেই, অর্থাৎ প্রবল শীতে ও খাদ্যাভাবে, পঞ্চাশ ষাট কোটি উলুখাগড়ার প্রাণ নাশ ঘটবে। অবশ্য রাজাদের কাছে এই উলুখাগড়াদের প্রাণের মূল্য নিতান্তই তুচ্ছ। সুতরাং এদের মরাবাঁচায় তাদের কিছু এসে যায় না।

আমরা তাই আবার রাজাদের প্রসঙ্গেই ফিরে আসি। দুই পরাশক্তির মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধ বাঁধলে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া এবং ইউরোপের পরিণতিটা কি দাঁড়াবে। এক কথায় পরিণতিটা হবে ভয়াবহ। বিজ্ঞানীরা অংক কষে যে উত্তর পেয়েছেন তার বারো আনাও যদি সত্যি হয় তাহলেও এই ভয়াবহ পরিণতির কোন ইতর বিশেষ ঘটবে না। এই বিস্তৃত অঞ্চল পরিণত হবে এমন এক মহাশ্মশানে যার জীবন্মৃত অধিবাসীরা মৃতদের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হবে। এ অঞ্চলে অধিকাংশ লোক ঘন বসতিপূর্ণ শহরে বাস করে। সুতরাং সর্বাত্মক পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই কোটি কোটি লোক নিহত হবে, কয়েক মাস না হলেও অন্তত কয়েক সপ্তাহ সূর্য তমসাচ্ছন্ন থাকবে, বিধ্বস্ত হবে বিস্তৃত অঞ্চল। সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণগুলিতে ধ্বংসের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তার পরিমার্জন নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। সুদূর প্রসারী প্রভাবের চিন্তা নিরর্থক কারণ সেই তমসাচ্ছন্ন মহাশ্মশানে কিছু কিছু জীবন্মৃত মানুষ খাদ্য পানীয় ও চিকিৎসার অভাবে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হবে এবং অধিকাংশই তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

পারমাণবিক যুদ্ধের এক নম্বর বাস্তবতা এই নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ!

পারমাণবিক অস্ত্রের দ্বিতীয় বাস্তবতা হল এই যে অস্ত্রের বিরুদ্ধে কোন রক্ষাকবচ নেই। অস্ত্রবিশারদরা সবাই এ সত্যটা জানেন। ন্যাটো জোটের সর্বাধিনায়ক জেনারেল রোজার্স সম্প্রতি এই মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে পরমাণুঅস্ত্রের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরক্ষা নেই।

পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারের বর্তমান স্তর এবং তৎসহ ক্ষেপনযন্ত্রের রকমারিত্ব এমন উন্নতি পর্যায়ে পৌঁছেছে যে কোন পরাশক্তির পক্ষে আকস্মিক পূর্ব আঘাতের দ্বারা প্রতিপক্ষকে নিরস্ত্র করতে পারার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। অসহনীয় মাত্রায় পারমাণবিক প্রতিশোধ গ্রহণের মত যথেষ্ট অস্ত্র প্রতিপক্ষের হাতে থাকবে। পারমাণবিক যুদ্ধ বিদ্যার সাম্প্রতিক বাদটির নাম 'ম্যাড' (MAD—Mutual Assured Destruction)। বাংলায় এই বাদটিকে আমরা বলতে পারি 'পারস্পরিক নিশ্চিন্ত বিনাশ' বাদ। পরমাণু অস্ত্রের তৃতীয় বাস্তবতা এই অভিনব 'ম্যাড বাদ'।

বর্তমান অস্ত্রভাণ্ডারের অংশ বিশেষই যখন নিবৃত্তি ঘটানোর জন্য যথেষ্ট তখন 'পারমাণবিক শ্রেষ্ঠত্বের' মত ধ্যানধারণা অর্থহীন। বর্তমান পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারের আয়তন ও মান বৃদ্ধির কোন সামরিক কৌশলগত তাৎপর্য নেই। এটাই পারমাণবিক অস্ত্রের চতুর্থ বাস্তবতা।

উভয় জোটের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতারা এই বিশেষ বাস্তবতার কথা জোরেসোরে ঘোষণা করেছেন। তা সত্ত্বেও উভয় পক্ষই ক্রমাগত উন্নত থেকে উন্নততর পারমাণবিক অস্ত্র স্তূপীকৃত করে

banglainternet.com

করে চলেছে যদিও তাঁরা নিশ্চিত জানেন যে প্রাযুক্তিক বা সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই অনুশীলন অর্থহীন। যুক্তি ও কর্মের এই বৈপরীত্যই আমাদের যুগের নির্মম পরিহাস।

নিরস্ত্রীকরণের সপক্ষে এত সব দামী দামী যুক্তি থাকা সত্ত্বেও ব্যাপারটা কিন্তু কার্যতঃ বিশেষ অগ্রসর হচ্ছে না। বরং অস্ত্রসজ্জার মাত্রা ও ব্যাপ্তি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগ বহু পূর্বেই পারমাণবিক অস্ত্রঘাটিতে পরিণত হয়েছে, এখন নূতন উদ্যমে কাজ শুরু হয়েছে কিভাবে মহাকাশকে অস্ত্রঘাটিতে পরিণত করা যায়। শুধু দুই পরাশক্তির ভাণ্ডারেই যে পারমাণবিক অস্ত্র মজুদ আছে তার কিয়দংশই 'বিজ্ঞ মানব' জাতির আবাসস্থল পৃথিবী নামক এই গ্রহটিকে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করার পক্ষে যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও কৌশলগত সমরাস্ত্রের সীমিতকরণ কিংবা হ্রাসের কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। অস্ত্র প্রতিযোগিতায় প্রতি মিনিটে ব্যয় করা হচ্ছে বিশ লাখ ডলার, প্রতি ঘণ্টায় বার কোটি ডলার, প্রতি দিন প্রায় দু'শ নব্বই কোটি ডলার আর প্রতি বছরে প্রায় তিন হাজার পাঁচ শ' কোটি ডলার!

উন্নত পাশ্চাত্য বিশ্বের যুক্তিবাদী সভ্য মানুষ। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস! সব জ্ঞান ও যুক্তি তারা বিসর্জন দিয়েছে এই সংহারক পরমাণু অস্ত্রের বেদীমূলে। যুক্তি বলছে, পরমাণু অস্ত্র বৃদ্ধি নিরর্থক। সংহারক দেবী বলছে, আমার ভোগ বৃদ্ধি কর, খিদে আমার মিটছে না। ভক্তের দল সাথে সাথে ষড়োপচারে নৈবেদ্য সাজিয়ে দেবীর তর্পণ করছেন। কিন্তু দেবীর ক্ষুধা যেমন প্রচণ্ড ভক্তের নিষ্ঠাও তেমনি অসীম। বিরতিহীন এই প্রবাহে কোন যতিচিহ্নের সন্ধান আজও মেলে নি।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমেরিকা যে সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বপ্ন দেখছিল, ১৯৬০ এর দশকেই তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কিন্তু জাত্যাভিমানের মত কড়া মদের নেশা কাটানো বড়ই শক্ত, বিশেষভাবে কুলপরিচয়হীন সদ্য ধনী সেই জাতির পক্ষে যার এই পৃথিবীকে দেওয়ার মত কোন গৌরবময় ঐতিহ্য নেই।

পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার এই গোলক ধাঁধা থেকে মানব জাতি পরিত্রাণ লাভ করতে সমর্থ হবে, না কি ঝাড়েমূলে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হবে? দুঃখিত, উত্তরটা আমার জানা নেই।

---

banglainternet.com